পরিচয়

পরিচয়

শ্রাবণ • ১৩৬৯

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায় চিত্র : এফ. রাবেল [মেক্সিকো]

সম্পাদক

গোপাল হালদার। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



১৫ই আগস্ট

নব ভারতের উন্নয়নের সঙ্গে নব বাংলারও রূপায়ন ঘটছে। আগামী দিনের সেই সমুজ্জ্বল রূপটি ঘিরেই আজকের এই প্রস্তুতি, এই পরিকল্পনা! পর পর ছুটি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দেশের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের দৃঢ় বনিয়াদ রচনার চেষ্টা হ'য়েছিল, সেই সঙ্গে হ'য়েছিল শিল্প, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও কারিগরী ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের প্রয়াস। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই প্রয়াস হবে আরও ব্যাপক, আরও সুষ্ঠু ও সর্বাত্মক কল্যাণ-মুখী। সংবিধানের সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছুতেও তা হবে সহায়ক।



সেই জন্যই আজ আমাদের নতুন ক'রে সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করবার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। সেই সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে গ'ড়ে উঠবে

নব ভারতের

সোনার বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত



অপূর্ব রান্না আর বাড়ীর মতো স্বাচ্ছন্দ্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের হোটেল

দিনযাপনের প্রতিটি মুহূর্ত পুরোপুরি উপভোগ করতে হলে







রাঁচী

হোটেল

স্থান সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে হোটেলের ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন

টেলিফোন নং রাঁচী ৪৫

পুরী

হোটেল

স্থান সংরক্ষণের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে হোটেলের ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন টেলিফোন নং পুরী ৬৩

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে





ঙ্কের শিশু — এফ. রাবেলা

দর্শনে সমসাময়িক পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাব

ভবানী সেন

মিলিক ক্যাপেক বিজ্ঞানের আধুনিকতম জটিল তথ্যসমূহ দ্বারা যান্ত্রিক বস্তুবাদ এবং ভাববাদ উভয়েরই অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন*। তাঁর দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি ডায়লেকটিক বস্তুবাদের খুব কাছাকাছি, কিন্তু খুব সম্ভবত মার্কসবাদী দর্শনের সঙ্গে লেখকের পরিচয় ঘনিষ্ঠ নয়, তাই তাঁর বিশ্লেষণ যান্ত্রিক বস্তুবাদ এবং সর্বপ্রকার ভাববাদের অসারতা প্রতিপন্ন করা সত্ত্বেও, স্থানে স্থানে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছতার দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। তথাপি দর্শনের আলোচনায় লেখকের অবদান নিঃসন্দেহে খুবই মূল্যবান।

স্থান ও কাল

লেখক খুবই তৎপরতার সঙ্গে প্রমাণ করেছেন যে যান্ত্রিক বস্তুবাদ এবং সর্বপ্রকার ভাববাদ নিউটন-লাপ্লাসের বৈজ্ঞানিক ধারণার মধ্যে আবদ্ধ এবং আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক আপেক্ষিকতাবাদের ও ইলেকট্রন তত্ত্বের দার্শনিক মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তাঁরা সেই ক্লাসিকাল বিজ্ঞানেরই প্রাথমিক ধারণার চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছেন।

লেখকের মতে ক্লাসিকাল বিজ্ঞান চারটি প্রাথমিক ধারণার দেওয়াল দিয়ে ঘেরা—এই চারটি ধারণা হলো: স্থান বা তল, সময়, বস্তু এবং গতি।

---

*Milic Capek. The Philosophical Impact of Contemporary Physics.

স্থান বা তল

ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের মতে স্থান অথবা 'তল' হলো একটি নির্বিশিষ্ট সত্তা। বস্তুর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, স্থানের মধ্যে বস্তু অবস্থিত, কিন্তু বস্তুশূন্য স্থানও আছে। স্থান সীমাহীন সনাতন এবং অনন্ত খণ্ডে বিভাজ্য, তার প্রতি অংশই সমধর্মী। স্থান বলতে বোঝায় একই সময়ে বর্তমান বা সহ-অবস্থিত বিন্দু-সমষ্টি।

সময় বা কাল

ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের চোখে কালও একটি স্বতন্ত্র নির্বিশিষ্ট সত্তা, তা সীমাহীন এবং স্রোতের মতো অনন্ত অংশে বিভাজ্য। স্থান একই সময়ে অবস্থিত বিন্দু-সমষ্টি, কিন্তু কাল হচ্ছে একটার পর আর একটা ঘটনার একটি ঘনসন্নিবিষ্ট রাশিমালাতে ব্যাপ্ত একটি ধারাবাহিক স্রোত।

বস্তু

বস্তুর প্রাথমিক সত্তা পরমাণু একটি নিরেট এবং স্থির বা গতিহীন সত্তা। স্থানে এবং কালে বস্তু অবস্থিত, কিন্তু স্থান এবং কাল থেকে বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

গতি

গতি মানেই নির্দিষ্ট সময়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন। বস্তুর বহির্ভূত কোনো শক্তি দ্বারা বস্তু গতি লাভ করে অথচ গতির কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। গতির এই ধারণা স্পষ্ট করতে গিয়েই এনার্জি বা শক্তির অবতারণা করা হয়েছে। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সংঘাত থেকেই গতির জন্ম।

সংক্ষেপে, এই কয়েকটি ধারণা নিয়েই ক্লাসিকাল বিজ্ঞান ও ক্লাসিকাল দর্শন তার সমগ্র চিন্তাধারা গড়ে তুলেছিল। এই ধারণা অবশ্যই অতিপ্রাচীন ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মানব-মনকে বহুল পরিমাণে মুক্ত করে প্রায় চার শতাব্দী যাবত প্রকৃতির ওপর মানব-মনের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর যান্ত্রিক বস্তুবাদ এই আধিপত্যেরই শীর্ষ-ফল এবং জয়তিলক।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আলোকের একটি বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লাসিকাল বিজ্ঞান এবং যান্ত্রিক বস্তুবাদের সঙ্কট শুরু হয়। ক্লাসিকাল বিজ্ঞান অনুসারে অনন্ত স্থানে এবং অনন্ত কালে আলোকের গতিবেগ বিভিন্ন দিকে এবং বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন হতে বাধ্য। কেননা, সময় যেহেতু অনন্ত ভাগে সমভাবে বিভাজ্য এবং স্থানও যেহেতু সমধর্মী অংশে বিভাজ্য একটি নির্বিশিষ্ট সত্তা, সুতরাং অন্য যে কোনো গতির মতোই আলোকের গতিবেগও আধার-বিশেষে প্রাপ্ত চাপ অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ হতে সক্ষম। সহজ ভাষায় প্রশ্নটি এই যে একটি বস্তুপিণ্ড যেমন ঘণ্টায় এক মাইল থেকে ঘণ্টায় লক্ষ-কোটি মাইল গতিবেগ লাভ করতে পারে, আলোকও তেমনি বিভিন্ন মাত্রার গতিবেগ লাভ করতে পারবে না কেন?

১৮৮২ সালে যখন মিচেলসনের একটি গবেষণার পর নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হলো যে আলোকের গতিবেগ সর্বদাই নির্দিষ্ট, তার কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না এবং কোনো বস্তুর চাপে বা কোনো মাধ্যমেই তার তারতম্য হয় না, তখনই বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক তত্ত্বজগতে একটি যুগান্তর ঘটে গেল।

উল্লিখিত যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে যখন আলোকের এই পরিচয় পাওয়া গেল যে তার গতিবেগ সর্বদাই এবং সর্বত্রই এক এবং অবিভাজ্য (প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল) তখন দেখা দিল এক নতুন সমস্যা। চাঁদ যখন পৃথিবী থেকে প্রত্যক্ষ হবার কথা তার এক সেকেণ্ড পর প্রত্যক্ষ হয়, কারণ চাঁদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে এক সেকেণ্ড লাগে। পোলারিস প্রত্যক্ষ হয় পঞ্চাশ বছর পর, কারণ পোলারিস থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছতে ৫০ বছর অতীত হয়ে যায়। আবার, এমন অনেক তারকা আছে যার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে কয়েক কোটি বৎসর লেগেছে, ইতিমধ্যে তার অস্তিত্বই গেছে বিলুপ্ত হয়ে, সুতরাং পৃথিবীর কাছে যখন তা বর্তমান, আসলে তখন তা অতীত, সুতরাং অতীত এবং বর্তমানের নির্বিশিষ্ট কোনো ভেদ নেই। উল্লিখিত বিলুপ্ত তারকার খুব নিকটে অবস্থিত কোনো তারকার নিকট যা এখন অতীত, পৃথিবীর কাছে তা এখন বর্তমান। এই নিয়েই শুরু হলো সময়ের আপেক্ষিকতাবাদ।

ভাববাদী দর্শন এই সমস্যার সমাধান করতে চাইল এই বলে যে সত্তার প্রকৃত অস্তিত্ব অজ্ঞেয়, আমাদের কাছে সত্তার অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের উপর (অর্থাৎ মনের উপর) নির্ভরশীল। ক্লাসিকাল বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক বস্তুবাদ এর

জবাবে বলেছিল যে, পৃথিবীতে আমার কাছে যা অতীত, বিশ্বব্যাপী মহাস্থানে অবস্থিত কোনো না কোনো জগতে এখন তা বর্তমান। এখন যদি কল্পনা করা যায় যে কোনো একটি বিন্দু অনন্ত পরিমাণ গতিবেগ নিয়ে মহাস্থানে চলছে তাহলে সে প্রায় একই সময়ে একই সঙ্গে সর্বত্র বর্তমান, কারণ প্রতি সেকেণ্ডে অনন্ত মাইল বেগে সে চলছে। এই অবস্থায় তার কাছে বিভিন্ন গ্রহ-তারকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের প্রকৃত সময়টি ধরা পড়বে, কারণ ঐ অনন্ত গতিবেগসম্পন্ন বিন্দুটির কাছে দৃষ্ট সময় এবং প্রকৃত সময়ের কোনো পার্থক্য নেই, কারণ সমস্ত গ্রহ-তারকার আলোক তার কাছে একই সময় পৌছয়।

কিন্তু এই তত্ত্ব একেবারেই ধূলিসাৎ হয়ে গেল—যখন আবিষ্কৃত হলো এই সত্য যে আলোকের গতিবেগ কেবল সীমাবদ্ধ নয়, ঐ গতিবেগই সর্বোচ্চ গতিবেগ ; অর্থাৎ কোনো পদার্থের পক্ষেই আলোকের গতিবেগের বেশি তো নয়ই, তার সমান গতিবেগ লাভও অসম্ভব এবং অবাস্তব। অনন্ত গতিবেগের কল্পনা গণিতের হিসাব অনুসারে একেবারেই উদ্ভট। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কি ?

সময়ের নির্বিশিষ্টতা যে কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত তা হলো অনন্ত গতিবেগসম্পন্ন একটি বিন্দুর সম্ভাবনা। কিন্তু যেহেতু কোনো গতিবেগই আলোকের চেয়ে বেশি হয় না, সুতরাং অনন্ত গতিবেগ তো হতেই পারে না ; অতএব সময়ের নির্বিশিষ্ট সত্তাটি নিছক একটি উদ্ভট কল্পনা। সময়ের আপেক্ষিকতাই নির্বিশিষ্ট সত্য। সময়ের এই আপেক্ষিকতা মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার ফল নয়। মহাবিশ্বে বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন গ্রহ-তারকার সময়গুলি বিভিন্ন। সর্বত্র পরিব্যাপ্ত কালস্রোত বলে কোনো নির্বিশিষ্ট সত্তা নেই।

তা যদি হয়, তাহলে স্থানেরও কোনো নির্বিশিষ্ট সত্তা নেই। কেননা নির্বিশিষ্ট স্থান মানেই একই সময়ে বর্তমান বিন্দুসমূহের সমষ্টি। যেহেতু সমগ্র মহাবিশ্বের জন্য কোনো একটা "একই সময়" হতে পারে না, সুতরাং মহাবিশ্বে একই সময়ে বর্তমান বিন্দুসমষ্টির ধারণাও কাল্পনিক এবং অসত্য। এই পৃথিবীর একটি স্থান আছে, তেমনি মহাবিশ্বে বিভিন্ন জগতের বিভিন্ন স্থান আছে। সুতরাং কালের মতো স্থানও সত্য সত্যই আপেক্ষিক। এই হলো আইনস্টাইনের স্পেশাল রিলেটিভিটি থিওরীর সারমর্ম। স্থান এবং

কালের সত্যকার পরিচয় কি সে সম্বন্ধে তিনি আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটি থিওরীর উল্লেখ করে বলেছেন যে স্থান, কাল এবং বস্তু সব মিলেই একটি অখণ্ড সত্তা এবং তার অস্তিত্ব ব্যক্তিনিরপেক্ষ বাস্তব সত্তা। মার্কস এবং এঙ্গেলস আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য ছাড়াই স্থান এবং কালকে বস্তুর অস্তিত্বের রূপ (Forms of Existence of Matter) বলে ঘোষণা করেছিলেন। স্থানের এবং কালের এই সংজ্ঞা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত এবং সুস্পষ্ট। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক পরোক্ষভাবে এই সংজ্ঞাতেই পৌছেচেন, কিন্তু বোধহয় তিনি মার্কসবাদী দর্শনের সঙ্গে পরিচিত নন বলেই, সুস্পষ্টভাবে এই সংজ্ঞাটি দিতে পারেন নি।

বস্তু ও গতি

ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের মতে বস্তুর ক্ষুদ্রতম ইউনিট এটম একটি নিরেট এবং গতিহীন পদার্থ। নিউটনের তত্ত্ব অনুসারে তার প্রধান দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো (১) পদার্থের (Mass-এর) সঙ্গে তার ভল্যুমের (অর্থাৎ ঐ পদার্থ কতটা স্থান জুড়ে আছে তার) একটা নির্দিষ্ট অনুপাত বিদ্যমান। (২) বস্তুর প্রাথমিক ইউনিটের আভ্যন্তরীণ পদার্থের পরিমাণ সর্বদাই নির্দিষ্ট।

এই বস্তুই বিশিষ্ট স্থানে বিশিষ্ট সময়ে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী স্থানমণ্ডলের এবং নির্বিশিষ্ট কালস্রোতের মধ্যে বর্তমান।

আইনস্টাইনের স্পেশাল রিলেটিভিটি থিওরী স্থান এবং সময়ের নির্বিশিষ্ট সত্তাটিকে অবাস্তব বলে প্রতিপন্ন করায় বস্তুর অস্তিত্ব হলো বিপন্ন। সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন তত্ত্বের আবিষ্কার তাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিল। বিংশ শতাব্দীর এই আবিষ্কারের ফলে দেখা গেল যে বস্তুর প্রাথমিক ইউনিটের (ইলেকট্রন-প্রোটন প্রভৃতির) আভ্যন্তরীণ পদার্থের সঙ্গে তার স্থানব্যাপ্তির (অর্থাৎ Mass এবং Volume-এর) কোনো নির্দিষ্ট অনুপাত নেই এবং তার পদার্থের পরিমাণও সর্বদা এক থাকে না। পদার্থের সঙ্গে তার গতিবেগের একটি আনুপাতিক সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ গতিবেগের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে পদার্থেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

কি করে তা হয় ? তা হয় এইজন্য যে এনার্জি বা শক্তি এবং পদার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা নয়, পদার্থ এবং শক্তি একই সত্তার বিভিন্ন রূপ।

এই আবিষ্কারের পর দার্শনিক ভাববাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, ঘোষণা করল যে বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই, অশরীরী শক্তিই বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন করেছেন যে ভাববাদ শক্তিকে বস্তু থেকে স্বতন্ত্র ধরে নিয়েই ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছেচে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুসত্তা সম্পর্কে যে নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত করেছে তার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে শক্তি ও পদার্থ পৃথক সত্তা নয়, একই বাস্তব সত্তা শক্তি ও পদার্থ এই দুই রূপে বর্তমান এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং শক্তি বা এনার্জি একটি অপার্থিব সত্তা নয়, বাস্তব সত্তা।

গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে ইতিমধ্যে আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে আবিষ্কৃত নতুন তথ্যদ্বারা উল্লিখিত সিদ্ধান্তই যথার্থ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। ১৯৩২ সালে এণ্ডারসন আবিষ্কার করলেন 'পজিটিভ ইলেকট্রন'। পরমাণুর ভারী কেন্দ্রে তীব্র শক্তি সঞ্চালিত হলে তার ভিতর দিয়ে যে দুই শক্তি বেরিয়ে আসে তার একটি নেগেটিভ ইলেকট্রন আর একটি 'পজিটিভ ইলেকট্রন'। পজিটিভ ইলেকট্রন ক্ষণস্থায়ী, তা খুব তাড়াতাড়ি একটি নেগেটিভ ইলেকট্রনের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখনই নেগেটিভ ইলেকট্রনটি রশ্মিতে পরিণত হয়। ঐ রশ্মিটিই বিটা রশ্মি নামে পরিচিত। ঐ বিটা রশ্মিই আলোকরূপে বিচ্ছুরিত হয়।

আলোকরশ্মি যখন কোনো পরমাণুর উপর পড়ে তৎক্ষণাৎ তার অবলুপ্তি ঘটে, অর্থাৎ আলোকের এনার্জিকে ঐ পরমাণু আত্মসাৎ করে নেয়।

সুতরাং আলোকরশ্মি হলো এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে বস্তুরই অভিগমন, সাধারণভাবে সমস্ত রশ্মি সম্বন্ধেই এই কথা খাটে।

সুতরাং বস্তু এবং গতি অভিন্ন, বস্তুর প্রাথমিক ইউনিট হলো গতিশীল বস্তু; গতিহীন বস্তু বা বস্তুহীন গতি একেবারেই অবাস্তব। বিশ্বপ্রকৃতিতে অহরহ বস্তুর উৎপত্তি ও বিলুপ্তি একই সঙ্গে ঘটছে অর্থাৎ বস্তুর রূপান্তর চলছে অহরহ। বস্তুর সঙ্গে গতির এই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হলো আর একটি অভিনব তথ্যের উদ্ঘাটনে।

ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের ধারণা ছিল এই যে শক্তির সঙ্গে তাপের একটি সম্পর্ক আছে। তাপই বস্তুর প্রাথমিক ইউনিটের মধ্যে গতিবেগ সঞ্চারের কারণ। নার্ন্স্ট আবিষ্কার করেন যে সম্পূর্ণ শূন্য ডিগ্রী তাপেও প্রাথমিক বস্তুসত্তার

কিছুটা এনার্জি বা শক্তি থেকে যায়। সুতরাং বস্তু ও শক্তি যে অভিন্ন সে সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহের কারণ রইল না। বস্তু মানেই গতিশীল বস্তু, গতিহীন বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই।

আধুনিক বিজ্ঞানের এই সমস্ত আবিষ্কার সত্ত্বেও যান্ত্রিক বস্তুবাদ এবং ভাববাদ নিজ নিজ চিন্তাধারা রক্ষা করেন ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের সেই সমস্ত মূল ধারণার সাহায্যে, যেগুলি এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে নস্যাৎ হয়ে গেছে। তাঁরা এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের তাৎপর্য আলোচনা করতে গিয়ে বার বার প্রশ্ন তোলেন বস্তুই আদি না শক্তিই আদি, বস্তু থেকে শক্তির জন্ম অথবা শক্তি থেকে বস্তুর জন্ম। এই দুয়ের যে স্বাতন্ত্র্য অবাস্তব বলে প্রতিপন্ন হয়ে গেছে, সেই স্বাতন্ত্র্যকেই সত্য বলে ধরে নিয়ে এই স্বাতন্ত্র্য-বিলুপ্তির তাৎপর্য খুঁজবার চেষ্টাতেই তাঁদের আলোচনা ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সবিস্তারে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে আধুনিক বিজ্ঞানীরা ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের বিকল্প নতুন নতুন ধারণার নতুন নামকরণ করতে পারেন নি, মানব-মন যে ক্লাসিকাল ধারণায় অভ্যস্ত তারই কাঠামোর মধ্যে থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন বলেই দার্শনিকেরা যান্ত্রিক বস্তুবাদ অথবা ভাববাদের অন্ধগলিতে ঘুরপাক খান।

কার্য-কারণ-তত্ত্ব

ক্লাসিকাল বিজ্ঞান অনুসারে কার্যকারণতত্ত্বের ভিত্তি হলো গতির প্রকৃতি। কোনো এক বস্তু যখন অপর বস্তু থেকে একটি শক্তি-চাপ প্রাপ্ত হয় তখন তা স্থান ত্যাগ করে এবং চাপের মাত্রা অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছয়। সুতরাং কোনো বস্তুর গতিবেগ (velocity) এবং অবস্থান (position) জানতে পারলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার নতুন অবস্থান সঠিক ভাবে জানা যায়।

হাইজেনবার্গ দেখান যে বস্তুগতির এই যান্ত্রিক নিয়ম পরমাণুর আভ্যন্তরীণ ইলেকট্রন সম্পর্কে খাটে না। ইলেকট্রনের অবস্থান এবং গতিবেগ থেকে তার নতুন অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না, কেননা ইলেকট্রনের অবস্থান এবং তার গতিবেগ একই সঙ্গে নির্ধারণ করা যায় না।

ভাববাদীরা অবশ্য প্রথমেই উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করলেন যে কার্যকারণ-তত্ত্ব এখন সমাধিস্থ, ইলেকট্রন চলে 'স্বাধীন ইচ্ছা' অনুসারে। সুতরাং ব্রহ্মবাদই সমস্ত বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান। আঘাতটা একটু সামলে নিয়ে যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা ঘোষণা করেন যে হাইজেনবার্গের তত্ত্ব অনুসারে ইলেকট্রনের অবস্থান এবং গতিবেগ এই উভয়ই একই সঙ্গে নির্ধারণ করা যায় না বলেই ইলেকট্রনের গতিবিধি সঠিকভাবে বোঝা যায় না। ত্রুটিটা বাস্তব সত্তার নয়, ত্রুটিটা পর্যবেক্ষণকারী ব্যক্তির। অমনি পজিটিভিস্ট দার্শনিক বলে উঠলেন "তাই তো বলি যে সত্তার যে পরিচয় আমরা পাই তা ব্যক্তির সীমাবদ্ধ পর্যবেক্ষণের ফল, প্রকৃত বাস্তব সত্তা অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। আমরা যা পর্যবেক্ষণ করি তা আমাদের হিসেবে মেলে কিনা শুধু এইটুকুই বলতে পারি, তার বেশি কিছু নয়।" ভাববাদী উত্তর দেন, "বটেই তো, তার বেশি জানবে কি করে, প্রকৃত বাস্তব সত্তা বলে নেই তো কিছুই, তথাকথিত বাস্তব সত্তা মন থেকেই সৃষ্ট।" এমনি ভাবেই যান্ত্রিক বস্তুবাদ, পজিটিভিস্ট দর্শন এবং ভাববাদ—এদের পারস্পরিক সমালোচনা কার্যত পারস্পরিক সমর্থনে পরিণত হয়।

এই দার্শনিক গোলকধাঁধার জবাবে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক তুলে ধরেছেন শ্রডিঙ্গার কর্তৃক ১৯৩৪ সালে আবিষ্কৃত একটি তথ্য। তথ্যটি এই যে প্রাথমিক বস্তুসত্তার 'নির্দিষ্ট অবস্থান' এবং 'নির্দিষ্ট গতিবেগ' থাকে না ; অর্থাৎ তার কোনো অবস্থানই এবং কোনো গতিবেগই কোনো বিশেষ একটি নির্দিষ্ট সময়েই 'স্থির' নয়, তা সতত সঞ্চরণশীল। সতত সঞ্চরণশীল বলতে বুঝতে হবে এই যে তার আভ্যন্তরীণ পদার্থ ও শক্তি, তার গতি ও গতিবেগ এবং তার অবস্থান পরস্পরকে একই সময়ে এবং একই সঙ্গে সৃষ্ট ও পুনঃসৃষ্ট করছে। বাস্তবে যা স্থির নয় তার স্থিরীকরণই তো অবাস্তব। তাই বহু ইলেকট্রনের সমবেত গতির একটি গড়পড়তা দিক-নির্ণয় করতে হয়, সুতরাং কার্য-কারণের হিসেবটা স্ট্যাটিষ্টিকাল সত্যের মতো সঠিক অবস্থার কাছাকাছি সত্য হয়। একটি ইলেকট্রনকে তার সমবেত ঝাঁক থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করলে যে ইলেকট্রনের বিচার হয় তা প্রকৃত ইলেকট্রন নয়। অথচ এক ঝাঁক ইলেকট্রনের মধ্যে একটির গতি সম্পর্কে কাছাকাছি সত্যনির্ধারণটা মিথ্যা বা মনের সৃষ্ট নয়। এটা বাস্তবসত্তারই সঠিক পরিচয়। ম্যাক্স প্লাংক গতি-শক্তির বিকীরণের পরিমাণ কষে দেখিয়েছেন যে এই সঞ্চরণশীল

শক্তি-পদার্থের বিকীরণও বহু আন্তো-বিন্দুর সমষ্টি, এবং এক একটি আন্তোবিন্দুর পরিমাণও নির্দিষ্ট (অর্থাৎ h)। এই তত্ত্ব অনুসারে নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্টের সীমারেখাই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ; সুতরাং তা অনির্দিষ্ট কেন হলো আর নির্দিষ্ট থেকে তার বিচ্যুতি কেন ঘটল এই সমস্ত প্রশ্নই অবাস্তব এবং অবান্তর। উল্লিখিত আন্তোবিন্দুটি আসলে দুই পরস্পর বিরোধী চরিত্রের একতার উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ ওর ভিতর তরঙ্গ এবং কণিকা এই দুয়ের ধর্ম একত্রে সমাবিষ্ট।

এই সিদ্ধান্ত ডায়লেকটিক বস্তুবাদেরই নির্ভুলত্ব প্রমাণ করছে। গ্রন্থকার কিন্তু সে কথা বুঝতে না পেরে গতির এই নিয়মটিকে অনির্দিষ্টতত্ত্ব (indeterminism) বলে বিবৃত করেছেন, যদিও তিনি বিশদভাবে প্রমাণ করেছেন যে তাঁর এই 'অনির্দিষ্টতত্ত্ব' কার্যকারণসম্পর্ক নস্যাৎ করে নি, আপেক্ষিক গতিহীন বস্তুর কার্যকারণের ঊর্ধ্বে গতিসমন্বিত সচল বস্তুর জটিল কার্যকারণতত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। এইভাবে গ্রন্থকার অচেতনভাবেই ডায়লেকটিক বস্তুবাদের মূল নিয়মটির গোড়ায় এসে পৌঁছেচেন। গ্রন্থকার যে কার্যকারণসম্পর্ককে অনির্দিষ্টতা বলে বর্ণনা করেছেন তা আসলে অনির্দিষ্টতা নয় ; তাও একরকম নির্দিষ্টতা—যান্ত্রিক নির্দিষ্টতা নয়, ডায়লেকটিক নির্দিষ্টতা।

তা সত্ত্বেও গ্রন্থকার ভাববাদ খণ্ডন করতে করতে প্রকারান্তরে ভাববাদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে ফেলেছেন। যখনই তিনি বললেন যে বিশ্বসত্তার প্রধান নিয়ম হলো একটি বিশেষ ধরনের অনির্দিষ্টতত্ত্ব (indeterminism) এবং এইটিই সার সত্য, তখনই তিনি বস্তুত কার্যকারণতত্ত্বের ভিত্তিমূল উড়িয়ে দিলেন। কারণ, তাঁর উক্তি অনুসারে যে কোনো ধরনের নির্দিষ্টতাই (Determinism) প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী। অথচ তিনিই স্বীকার করেন যে কার্যকারণতত্ত্বের মূলকথা সময়-পরম্পরায় ঘটনার সংঘটন, এবং এই নিয়ম নস্যাৎ হয় নি। গ্রন্থকারের এই স্ববিরোধিতা আরও বহুস্থানে লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, দার্শনিকদের একটি প্রশ্ন ধরা যাক। বস্তু অবিনশ্বর না, বস্তুর ধ্বংস এবং সৃষ্টি আছে। গ্রন্থকার বলছেন বস্তু অনবরতই ধ্বংস হচ্ছে এবং অনবরতই তার সৃষ্টি হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ—বিটা রশ্মি নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুপ্ত থাকে না, আলোক বিকীরণের ভেতর তার সৃষ্টি এবং বিকীরণের শেষ অঙ্কে তার লয়। যে ভাববাদীরা বস্তুসত্তাকে

অপরিবর্তনীয় মনে করেন এবং বিকাশকে যাঁরা সুপ্তসত্তার আত্মপ্রকাশ বলে বর্ণনা করেন তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রন্থকারের এই উদাহরণ একটি মোক্ষম অস্ত্র। কিন্তু গ্রন্থকার বুঝছেন না যে তিনি যেটা লক্ষ্য করেছেন তার আসল তাৎপর্য বস্তুসত্তার রূপান্তর এবং পরিমাণের পরিবর্তনে গুণগত পরিবর্তন। তিনি যাকে সৃষ্টি বলে মনে করছেন তা আসলে আলোকের অবলোপ, অর্থাৎ পুরাতন আধারে নতুন অভ্যুদয়।

ডায়লেকটিক বস্তুবাদ বিশ্বসত্তার তিনটি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছে—(১) বিরুদ্ধসত্তার ঐক্য, (২) পরিমাণের পরিবর্তনসূত্রে গুণগত পরিবর্তনের আবির্ভাব এবং (৩) অবলোপের অবলোপ (Negation of negation)। এই তিনটি নিয়ম বুঝলে যাকে আপাতত ধ্বংস ও সৃষ্টি মনে হচ্ছে তা আসলে সত্তার ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্ন আবির্ভাব-তিরোভাবের একটি অপূর্ব ঐক্য। যা ছিল তা থাকছে না, যা হচ্ছে তা যা ছিল তারই বিকশিত গুণসম্পন্ন নতুন রূপ। সুতরাং বস্তু আসলে অবিনশ্বর এবং শাশ্বত।

এই ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থকার সত্তা (Being) এবং সঞ্চরণের (Becoming) ডায়লেকটিক যোগসূত্র দেখেছেন এবং ধরেছেনও ; কিন্তু তবু তাঁর মূল দার্শনিক সিদ্ধান্তের জন্য তা ঠিক রঙ করতে পারেন নি।

কৃষ্ণ-আফ্রিকার অতীত ও বর্তমান

রণজিৎ দাশগুপ্ত

আফ্রিকা মহাদেশের সঙ্গে ইওরোপ-আমেরিকার সম্পর্ক পাঁচ শ বছরেরও বেশি। কিন্তু কি সেই সম্পর্কের প্রকৃতি? কেমন করেই বা বিবর্তিত হয়েছে সে সম্পর্ক? সে সম্পর্কের থেকে কোন বিশেষ ফল বর্তেছে কালো আফ্রিকার জীবনে? আর আফ্রিকাবাসীর প্রতিক্রিয়াই বা কি হয়েছে এই সম্পর্কের বিষয়ে? এসব জিজ্ঞাসার বিস্তারিত আলোচনা ও উত্তর পাওয়া যাবে আলোচ্য বই তিনটিতে*।

তিনটি বই-ই মুখ্যত সাহারার দক্ষিণস্থ আফ্রিকা বিষয়ক। তবে এর মধ্যে বেসিল ডেভিডসনের আলোচনার বিষয় হলো ১৪৪১ সালে গিনী উপকূলে পর্তুগীজ জাহাজের প্রথম নোঙর ফেলা থেকে শুরু করে দাস ব্যবসায়ের অবসান। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ও আধিপত্যের যুগে ইওরোপ-আফ্রিকার সম্বন্ধের বিষয়ে বিশদ বিশ্লেষণ রয়েছে জ্যাক ওডিসের প্রথম বইটিতে। আর তাঁর দ্বিতীয় বইটি থেকে জানা যাচ্ছে এই সম্বন্ধে যুগান্তকারী পরিবর্তনের বৃত্তান্ত।

তিনটি বই তিনটি ভিন্ন পর্ব সম্পর্কে, দু-জন লেখকের রচনাভঙ্গিও দু-রকমের। কিন্তু তবু বই তিনটির নানা তথ্য ও তত্ত্ব, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত। আফ্রিকেয় মানবতার প্রতি পশ্চিমের নিষ্ঠুর অবমাননার বিষয়ে সুতীব্র বেদনা, পাঁচ শ বছর ধরে উপেক্ষিত লক্ষ লক্ষ কালো মানুষগুলির জন্য নিবিড় সহানুভূতি, বিশাল মহাদেশের এক প্রান্ত

---

*Basil Davidson. Black Mother—Africa : The Years of Trial. Victor Gollanez Ltd., London. 1961.

*Jack Woddis. Africa : The Roots of Revolt. Lawrence and Wishart, London. 1960.

*J. Woddis. Africa : The Lion Awakes. Lawrence and Wishart, London. 1961.

থেকে আরেক প্রান্তব্যাপী বিপুল আলোড়নের যথার্থ পটভূমিটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংবেদনশীল প্রয়াসের পরিচয় তিনটি বইয়েই বর্তমান। আর এই প্রয়াসে নিঃসংশয়িত কৃতিত্বের জন্য ঐকান্তিক অভিনন্দন দু-জন লেখকেরই প্রাপ্য।

এক

আফ্রিকার অতীত নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, এবং সে মহাদেশ একমাত্র হিংস্র পশু আর মানুষ-খেকো অসভ্যদের বিচরণক্ষেত্র—এই ধারণাটিকেই গত কয়েক শতক ধরে বিতরণ করা হয়েছে সচেতনভাবে, সযত্নে, সুকৌশলে। কিন্তু গর্বোদ্ধত ইওরোপের এ দৃষ্টি যে সত্যদৃষ্টি নয়—এটা বেসিল ডেভিডসনের আফ্রিকা-চর্চার গোড়ার কথা। ভ্রমণকারী, নাবিক ও ঐরকম আরও অনেকের বিবরণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষের সাক্ষ্যসমূহকে ব্যবহার করে তিনি দেখিয়েছেন ইওরোপের সঙ্গে আফ্রিকার প্রথম সংযোগ-মুহূর্তটিতে, এবং আসলে তার বেশ কিছু আগেই, মৌলিক বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও কতকগুলি দিক দিয়ে ইওরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অনুরূপ আফ্রিকেয় উপজাতীয়-সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল; দেখা দিচ্ছিল লৌহ যুগের পক্ষে স্বাভাবিক ক্ষমতা-কেন্দ্রীকরণ ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার; উদ্ভব হয়েছিল পূর্ব আফ্রিকার উপকূলে উন্নত নগর-রাষ্ট্রের; প্রসার ঘটেছিল লিখিত সাহিত্যের; গড়ে উঠেছিল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য জীবন। এসব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হচ্ছে অবশ্য এই হালে, আর দীর্ঘকালের অবহেলায় অনেক সূত্রই গেছে হারিয়ে। তাই আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কাজ নিঃসন্দেহেই দুরূহ, এবং সে চেষ্টা আলোচ্য বইয়ে করা হয় নি। কিন্তু এ বইয়ের বিশেষ মূল্য হলো: শ্রীযুত ডেভিডসন আলোকপাত করেছেন নতুন নতুন দিকের উপর, গবেষণা ও অনুসন্ধানের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি এবং বেশ কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের তিনটি অঞ্চল—গিনী উপকূল, কঙ্গো ও পূর্ব আফ্রিকা উপকূলের সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে। আর এ প্রসঙ্গে যেটুকু আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন তা একই সঙ্গে বিদগ্ধ এবং মনোজ্ঞ।

কিন্তু কালো আফ্রিকার প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ, সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের নিজস্ব ধারা, সাহিত্য ও মানস সম্পদের চর্চা—এ সবই

প্রথমে বিপর্যস্ত এবং তারপরে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল পশ্চিম ইওরোপের সঙ্গে সংঘাতের প্রচণ্ডতা ও ব্যাপকতায়, এ সব একেবারেই হারিয়ে গেল পশ্চিম ইওরোপের বিরাট লোভের অতল গহ্বরে। আর এটাই শ্রীযুত ডেভিডসনের আলোচনার মুখ্য বিষয়।

ইওরোপের সঙ্গে আফ্রিকার বাণিজ্যিক লেনদেন গোড়ার দিকে চলত একদিকে হাতির দাঁত, মশলা, আফ্রিকেয় কুটিরশিল্প-জাত নানা পণ্য, এমন কি কাপড়; আর অন্যদিকে এ সবের দাম হিসেবে রুপো, ঘোড়া, বন্দুক, ইওরোপীয় বিলাস পণ্যাদি নিয়ে। এ লেনদেনের ভিত্তি ছিল সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সম্পর্ক গেল বিলকুল পাল্টে। বাণিজ্যিক লেনদেনের বদলে শুরু হলো সভ্য ইওরোপের মানুষ ধরার বর্বর অভিযান, হাতির দাঁত সোনা আর মূল্যবান রত্নের ব্যাপক লুণ্ঠন, গোটা আফ্রিকা জুড়ে দস্যুবৃত্তি আর নরমেধ পর্ব। ১৪৪৩-৪৪ সালে মাত্র ৪৯ জনকে বন্দী করে পাঠানো হয়েছিল লিসবনে। পরবর্তী ৩০ বৎসরে সংখ্যাটি স্ফীত হয়ে দাঁড়াল ৩,৫০০-এ। ১৫৯২ সালে স্পেনীয় ঠিকাদার গোমেশ রেনালের চুক্তি ছিল ৯ বৎসরে ৩৮,২৫০ গোলাম চালানের। ১৭০২ সালে একটি ফরাসী কোম্পানীর ঠিকা ছিল ৩৮,০০০ গোলাম চালান দেওয়ার। ১৭১৩ সালে ইংরেজ ঠিকাদারদের চুক্তি ছিল ৩০ বৎসরে ১৪৪,০০০ গোলাম রপ্তানির। শ্রীডেভিডসন কম করেই হিসেব করেছেন—কিন্তু সে হিসেব অনুসারেই চার শ বছরে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, কিউবা, স্পেনীয় উপনিবেশ ও আমেরিকা মহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে আখ, তুলো, তামাকাদি আবাদের জন্য প্রয়োজনে চালান দেওয়া হয় মোট ৫ কোটি গোলাম। এর উপরে আরও কত মানুষকে খুন হতে হয় তার তো কোনো লেখা-জোখা নেই। কি ভাবে ধরা হতো এই মানুষগুলোকে, কেমন করে তাদের ছিনিয়ে আনা হতো দেশ-গাঁ ও প্রিয়জনদের কাছ থেকে, কেমন করে মুরগী-ঠাসা অবস্থায় জাহাজ বোঝাই করে রপ্তানি করা হতো এই মানুষ-পণ্যগুলিকে, ধর্মব্যবসায়ী খ্রীস্টান পুরোহিতরা কি ভণ্ডামির সঙ্গে উদ্ধার করত এদের পতিত আত্মাকে, আর কি বিচিত্র যুক্তিতে পশ্চিম ইওরোপ স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিল মানুষের প্রতি মানুষের এই আচরণকে—সেই বীভৎস, রক্তাক্ত ইতিহাসের নানা খুঁটিনাটি শ্রীডেভিডসন তুলে ধরেছেন।

কিন্তু কি পরিণতি ঘটল মানুষ নিয়ে এই অমানুষিক ব্যবসায়? একদিকে,

কম করেও অন্তত পাঁচ কোটি মানুষ, পাঁচ কোটি সুস্থ সবল মানুষ, পাঁচ কোটি পরিশ্রমী বুদ্ধিমান কল্পনাপ্রবণ মানুষের এই অপহরণ পঙ্গু ও বিকৃত করে দিল সমগ্র আফ্রিকার সামাজিক বিকাশ, বাস্তব কর্মতৎপরতা ও ধ্যান-ধারণাকে। অন্যদিকে, দাসব্যবসায়ী, আমেরিকার বসতি স্থাপনকারী ইওরোপীয় আর পশ্চিম ইওরোপীয় বণিকদের লাভের অঙ্ক উঠল ফেঁপে-ফুলে। আর এই প্রক্রিয়াতেই লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার ও অনুরূপ নগরে বন্দরে ঘটল শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের 'প্রাথমিক সঞ্চয়'। এ প্রসঙ্গে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে মার্কসের সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায় শ্রীযুত ডেভিডসনের বিশ্লেষণে। তিনি দেখিয়েছেন: "...the trade with West Indies consisted in simple exchange of cheap manufactured goods for African slaves; of African slaves for West India food-stuffs and tobacco; and of these products, once brought to Europe, for a high return in cash. Out of this rapid economic expansion there flowed the circumstances that enabled England to achieve an industrial revolution." এবং শুধু ইংল্যাণ্ডে নয়, ফ্রান্সেও ঘটল সদৃশ বিকাশ।

এই নির্মম ব্যবসার অবসানের পিছনে রয়েছে নানা কারণ। কিন্তু এই বহুবিধ কারণের মধ্যে শ্রীডেভিডসনের বিবেচনায় সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো অর্থনৈতিক কারণ। তাঁর এ সিদ্ধান্ত মূলত সঠিক যে শিল্প বিপ্লবের ফলে মানুষ-পণ্যের প্রয়োজন গেল ফুরিয়ে, পরিবর্তে দেখা দিল শিল্পপণ্য বেচার উপযোগী বিস্তীর্ণ বাজার, কাঁচামালের উৎস এবং আর কিছুকাল পরে মূলধন লগ্নীর জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রের প্রয়োজন। ফল হিসেবে ইওরোপ-আফ্রিকার সম্পর্কে ঘটল পর্বান্তর।

দুই

আফ্রিকার বাণিজ্য বিস্তারের পাশাপাশি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রসার শুরু হয়েছিল পনেরো শতকেই। শিল্প বিস্তারের পরবর্তী প্রয়োজন পূরণের জন্য এই রাজত্ব প্রসারের গতি হলো ত্বরান্বিত, শুরু হলো ইওরোপীয় প্রতিযোগীদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার ঝগড়া। সাময়িক আপোষ-মীমাংসা হলো ১৮৮৫ সালের বার্লিন সম্মেলনে। বিশ শতকের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রায়

গোটা মহাদেশটা ভাগাভাগি হয়ে গেল জার্মান সাম্রাজ্য (ট্যাঙ্গানাইকা, টোগোল্যাণ্ড), ইতালীয় সাম্রাজ্য (ত্রিপোলি, সোমালিল্যাণ্ড), ফরাসী সাম্রাজ্য (আলজিরিয়া, মরক্কো, গিনী), ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (কেনিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ রোডেশিয়া, গোল্ড কোস্ট), পর্তুগীজ সাম্রাজ্য (এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক), বেলজিয়ান সাম্রাজ্য (কঙ্গো) ইত্যাদির মধ্যে। এবারে সত্যিই ঘন অন্ধকারের যবনিকা নেমে এলো আফ্রিকার জীবনে।

ইওরোপ-আফ্রিকার সম্পর্কের এই নতুন পর্বে বিদেশী মূলধনের লগ্নী ঘটে হীরে আর কয়লা, সোনা আর তামার খনিতে, আমদানি রপ্তানির প্রয়োজনে রেলপথ আর বন্দর উন্নয়নে, আবাদ শুরু হয় কোকো আর কফি, তুলো আর তামাকাদি অর্থকরী ফসলের। আর ৭০ বছর ধরে আফ্রিকার অফুরন্ত কাঁচামাল ও খনিজ সম্পদ লুণ্ঠন এবং সস্তা মজুর শোষণের মাধ্যমে জমে ওঠে বিদেশী খনি আর রেল, ব্যাঙ্ক আর বাগিচা কোম্পানীর মুনাফার পাহাড়, আফ্রিকাবাসীর অন্তহীন দুর্দশার বিনিময়ে গড়ে ওঠে লণ্ডন, বার্লিন, ব্রাসেলস, লিসবন, প্যারিসের আকাশছোঁয়া সমৃদ্ধি। এই নির্মম শোষণের প্রকৃতি ও পন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে জ্যাক ওডিসের প্রথম বইটিতে।

জ্যাক ওডিস দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ মাথা খাটিয়ে, ভেবেচিন্তে, হিসেব কষে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যার ফলে প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতি গেছে ভেঙে, সস্তা শিল্পজাত পণ্যের প্রতিযোগিতায় দেশজ কুটির ও হস্তশিল্প হয়ে গেছে ধ্বংস। পরিণামে জীবিকানির্বাহের চিরাচরিত উপায়গুলি হয়ে গেছে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

এই সঙ্গে উর্বর জমি, ভালো জমি, সুবিধাজনক অবস্থানের জমি আনা হয়েছে মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের কবলে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৮৯ শতাংশ জমিই শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত। আর আফ্রিকার সন্তানদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অনুর্বর, জলা, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, পীড়াক্রান্ত অঞ্চলে। এর উপরে নিজেদের পছন্দমতো ফসল চাষের অধিকারকেও করা হয়েছে খর্বিত।

এসব ব্যবস্থার লক্ষ্য সুস্পষ্ট, নির্দিষ্ট: আফ্রিকেয় জনসাধারণকে পাকাপাকিভাবে নিঃস্ব করে রাখা; জমিহারা, উপার্জনের বিকল্প সুযোগ-হারা, দুর্দশাগ্রস্ত আফ্রিকেয়দের ইওরোপীয় প্রভুদের জন্য খনি ও রেলপথ,

বাগিচা ও বন্দরে কাজ করতে, নামমাত্র মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করা।

কিন্তু এই ব্যবস্থাবলীও ইপ্সিত লক্ষ্য পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়—এরকম বিবেচনার থেকেই আফ্রিকেয়দের উপর চাপানো হয়েছে বিপুল কর, নগদ অর্থে দেয় কর, নিত্য নতুন করের বোঝা। এ কর যথাসময়ে না দিতে পারার অর্থ গ্রেপ্তারী, সশ্রম কারাদণ্ড, বাধ্যতামূলক শ্রম। অতএব কর না দিয়ে রেহাই নেই—কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন নগদ অর্থের। আর আফ্রিকার উপনিবেশিক কাঠামোতে নগদ অর্থ প্রাপ্তির উপায় মাত্র দুটি: (ক) ইওরোপীয় খনি-কারখানা-বাগিচার রক্ত জল করা সস্তা শ্রম, আর (খ) রপ্তানির জন্য বাজারে বিক্রয়যোগ্য অর্থকরী ফসলের চাষ। এ দুটোই যে ঔপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ সবের উপরে রয়েছে উগ্র বর্ণ বৈষম্যের নীতি। এ নীতির অবশ্য নানা দিক রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে যা বিশেষ করে ও সম্পূর্ণ সঠিক-ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে তা হলো পার্কে বসা কিংবা হোটেলে খাওয়া, বাসে চড়া কিংবা গীর্জায় যাওয়া, শিক্ষালাভ করা কিংবা চিকিৎসা করানো, কাজ দেওয়া কিংবা মজুরি পাওয়া, পদোন্নতি হওয়া কিংবা ভোট দেওয়ার মতো বিবিধ ক্ষেত্রে আফ্রিকেয় জনসাধারণকে শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার ও সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখার অর্থও একই; অর্থাৎ ইওরোপীয় প্রতিষ্ঠান-গুলির জন্য শ্রমিক-কর্মচারীর জোগান, সস্তা জোগানকে নিশ্চিত করা। আর এ লক্ষ্যভেদে সাফল্যের জন্য বাহবা ঔপনিবেশিক প্রভুদের অবশ্য প্রাপ্য।

আফ্রিকায় ইওরোপের 'civilising mission'-এর কথা হামেশা শোনা যায়। কিন্তু সে পবিত্র মিশনের দৌলতে আশ্চর্য সস্তা শ্রমের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মুনাফা চলে গেছে বিদেশে; বিভিন্ন দেশ পরিণত হয়েছে রপ্তানি-নির্ভর, এক-ফসলী কৃষি অর্থনীতিতে; ইওরোপ-আমেরিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যাপী সংযোগের পরও পত্তন হয় নি আধুনিক শিল্প ও উৎপাদনের সামান্যতম ভিত্তি; বিকাশ ঘটে নি দেশীয় শিল্পপতি ও ধনিক শ্রেণীর কিংবা স্থায়ী, দক্ষ শ্রমিক বাহিনীর; আর এসবের পরিণামে এই বিশাল মহাদেশ জুড়ে আফ্রিকাবাসীর জীবনে বাসা বেঁধেছে অনশন-অর্ধাশন, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য।

এ সম্পর্কে শ্রীওডিস যে বিস্তারিত সংবাদ ও সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন তা ভয়াবহ ও মর্মান্তিক।

তিন

আফ্রিকাবাসীরা কিন্তু নির্বিবাদে মেনে নেয় নি নিষ্ঠুর শোষণ ও সীমাহীন দুর্গতির এই বন্দোবস্তকে। জমির অধিকার ও করের বোঝা, মজুরির স্বল্পতা ও বর্ণবিদ্বেষ, শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা ও অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা, চিকিৎসার সুযোগ ও রাজনৈতিক অধিকারের মতো বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বারে বারে বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। সে বিক্ষোভ কখনো প্রকাশ পেয়েছে কর বন্ধের আন্দোলনে, কখনো কোনো আবাদ বয়কটে, কখনো বিশাল সভা-শোভাযাত্রায়, কখনো আবার শ্রমিক ধর্মঘটে কিংবা আইন অমান্য আন্দোলনে। সে বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী ১৬।১৭ বছরে। কেনিয়ার কফি বাগানে, উগাণ্ডার তুলো ক্ষেতে, রোডেশিয়ায় তামার খনিতে, কঙ্গোয় টিনের খনিতে, এ্যাঙ্গোলার গহন অরণ্যে, ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের তীরে জেগে উঠেছে আফ্রিকার সিংহ। আর সেই জাগরণের তরঙ্গায়িত আলোড়নে দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বন্দোবস্ত। শ্রীযুত ওডিসের 'Africa—The Lion Awakes' বইটি এই জাগরণের ইতিবৃত্ত।

মাত্র অল্প কিছুকাল আগেও সাম্রাজ্যবাদী মহলে এ ধারণাই প্রবল ছিল যে বিশ্বের অন্যত্র যাই ঘটুক না কেন আফ্রিকা সম্পর্কে উদ্বেগ বোধ করার কোনো কারণ তাদের নেই। কিন্তু এ ধারণা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেছে গত কয়েক বছরের আলোড়নে। এ আলোড়নের প্রচণ্ডতা, তীব্রতা ও ব্যাপ্তির পিছনে রয়েছে নানা কারণ। আফ্রিকেয় সৈন্যেরা ব্যাপকভাবে অংশ নিয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে; তারা দূর বিদেশে সঞ্চয় করেছে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আফ্রিকেয়রা দেখেছে ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়ার পরাজয়, শুনেছে 'চার দফা' স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি। কালো আফ্রিকা প্রত্যক্ষ করেছে ১৯৪৫ সালের পরে এশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত মুক্তি আন্দোলনের বিপুল জোয়ার; তারা প্রত্যক্ষ করেছে ১৯৫০ সালে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ চীনের মুক্তি এবং পরবর্তী অগ্রগতি। এই বিশাল মহাদেশ প্রত্যক্ষ করেছে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক

ও ভাবাদর্শগত বিস্ময়কর সাফল্য ও প্রগতি। এ সবের সঙ্গে ১৯৫৬ সালে বান্দুং-এর আফ্রো-এশিয়া সম্মেলন অনুপ্রাণিত করেছে আফ্রিকেয় জাতীয় আন্দোলনকে। ঘানার কনভেনশন পিপলস পার্টি, গিনীর ডেমোক্রেটিক পার্টি, দক্ষিণ রোডেশিয়ার ন্যাশন্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতির মতো জাতীয় দলগুলির নেতৃত্বে শুরু হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নব পর্যায়। আমেরিকান নিগ্রো নেতা ডু বোয়ার উদ্যোগে ১৯১৯ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের প্রভাবে দানা বাঁধতে থাকে আফ্রিকেয় ঐক্য ও সংহতির আদর্শ। এ সবের সঙ্গে শ্রমিক-কর্মচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি, তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ এবং শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের দ্রুত প্রসার বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে উপনিবেশবাদবিরোধী কর্মতৎপরতার অগ্রগতি সাধনে। গিনীর রাষ্ট্রপতি সেকু তুরে কিংবা কেনিয়ার জাতীয় নেতা টম মবোয়া সহ অনেক আফ্রিকেয় নেতাই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে। আফ্রিকায় জাতীয় ধনিক শ্রেণীর বিকাশ ও দুর্বলতার পটভূমিতে শ্রমিক আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জ্যাক ওডিস। এবং এটা এ বইয়ের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। কেন না আফ্রিকার জাতীয় আন্দোলন সংক্রান্ত অন্যান্য বইতে এ দিকটি সচরাচর উপেক্ষিত।

এই সব নানা ধারায় পুষ্ট জাতীয় আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান সাফল্য ১৯৫৭ সালে ঘানার স্বাধীনতা প্রাপ্তি। তারপর ১৯৬০ সালের মধ্যে একের পর এক স্বাধীনতা লাভ করে ২৫টি দেশ। ১৯৬০ সাল চিহ্নিত হয় 'African year' বা 'আফ্রিকার বছর' হিসেবে।

টোরী প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান থেকে লেবার পার্টির নেতা গেটস্কেল পর্যন্ত অনেকেই আজকাল বোঝানোর চেষ্টা করছেন, আফ্রিকেয় দেশগুলির এ স্বাধীনতাপ্রাপ্তি প্রাক্তন প্রভুদের চেষ্টা, শিক্ষা, যত্ন ও বদান্যতার ফল। কিন্তু আসল ব্যাপার যে একেবারেই বিপরীত তার প্রমাণ অজস্র। শ্রীওডিস দেখিয়েছেন, সামান্য মজুরি বৃদ্ধি থেকে শুরু করে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের প্রতিটি প্রয়াসকে চেষ্টা করা হয়েছে চরম হিংস্রতার সঙ্গে রক্তের বন্যা ও সন্ত্রাসের বর্বরতায় স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য। এক কেনিয়াতেই খুন করা হয়েছে ১১ হাজার দেশপ্রেমিককে। কেন? ৬৫ লক্ষ কেনিয়াবাসীর মধ্যে ৬৩

হাজার শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দার স্থূল স্বার্থে। ৯০ লক্ষ অধিবাসীর দেশ আলজিরিয়ায় ১০ লক্ষ ফরাসী বাসিন্দার স্বার্থে হত্যা করা হয়েছে ১০ লক্ষ আরবকে। এ্যাঙ্গোলা আর কঙ্গো, রোডেশিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকা প্রায় প্রতিদিনই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আফ্রিকার রক্তক্ষরণের অবসান আজও ঘটে নি।

তদুপরি মনে রাখা দরকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই এ সব দেশে সমস্যার শেষ নয়। তার জন্য প্রয়োজন আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন, শিল্পের বিকাশ, সামন্ততান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল অবশেষের অবসান, কৃষি অর্থনীতির বৈচিত্র্য সাধন, সমাজের সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবন। কিন্তু শ্রীওডিসের মতে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির এ পথ প্রশস্ত নয়। আজও এ সব দেশ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নানা সূত্রে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে বাঁধা, আজও অতীতের মতো কোটি কোটি টাকার মূল্যবান সম্পদ, বিনিয়োগযোগ্য অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত লুণ্ঠিত হচ্ছে প্রতি বছর। আজও এ সব দেশে নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক অধিকার ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রাক্তন প্রভুদের কুটিল চক্রান্তের শেষ নেই। এ বিষয়ে পুরনো ঔপনিবেশিক দেশগুলির সঙ্গে যোগ দিয়েছে উত্তর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও পশ্চিম জার্মানী। আর এক্ষেত্রে সর্দার, সামন্ত মালিক, ধনিকদের একাংশ প্রভৃতি দেশীয় সাকরেদও রয়েছে বেশ কিছু। আর এ চক্রান্ত সদ্য স্বাধীন দেশগুলির জীবনে কি সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে তার নমুনা পাওয়া গেছে কঙ্গোতে।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আফ্রিকেয় নেতারা উপরোক্ত বিপদ সম্পর্কে অনবহিত নন। ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অল আফ্রিকান পিপলস কনফারেন্সে সতর্কবাণী ঘোষিত হয়েছে নয়া-উপনিবেশবাদের কূট কৌশলের বিরুদ্ধে। তা ছাড়া ঘানা, গিনী ও মালি ফেডারেশনে বলিষ্ঠ, দৃপ্ত আয়োজন চলেছে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের। ইস্পাত ও অন্যান্য বুনিয়াদী শিল্পের প্রতিষ্ঠা, বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার, সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মতো ব্যবস্থাবলী গৃহীত হয়েছে কম-বেশি এ তিনটি দেশেই। এবং এ ব্যবস্থাবলী সূচিত করছে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ পরিহার করে নতুন পথে, অ-ধনতান্ত্রিক পথে জাতীয় উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনা। অবশ্য এ বিরাট মহাদেশে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের বিকাশ ও পরিস্থিতিতে বৈপরীত্য প্রচুর, নাইজেরিয়ার মতো অনেক দেশে ঘটনাবলীর ঝোঁক অন্য দিকে, এবং এ

পটভূমিতে আফ্রিকার মূলগত সমস্যাগুলির সমাধান যে জটিল ও সময়সাপে
সে কথা বর্তমান আলোচনাপ্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার।

সব শেষে এ কথা বলা দরকার যে আফ্রিকেয় জাগরণে ট্রেড ইউনিয়নে
গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিশ্লেষণের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী নেতা, বুদ্ধিজীবী
রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকার আরও যদি বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যে
কিংবা আলজিরিয়া, এ্যাঙ্গোলা ইত্যাদি দেশের রক্তাক্ত সংগ্রামের সঙ্গে ঘা
গিনী প্রভৃতি দেশের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পথে স্বাধীনতা অর্জনের তাৎপর্য
যদি উপস্থিত করা হতো, তবে শ্রীওডিসের আলোচনা আরও সম্পূর্ণ ও সার্থ
হতো। তবে এ রকম কোনো কোনো বিষয়ে অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আলোচ্য গ্রন্থ
আফ্রিকার বর্তমানকে জানার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। এবং এ গ্রন্থের থেকে
এটাও সুস্পষ্ট যে কালো আফ্রিকার শৃঙ্খলমুক্তিতে শুধু আফ্রিকার ইতিহাসে
নয়, সারা বিশ্বের ইতিহাসে সংযোজিত হয়েছে অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ নতু
এক অধ্যায়।

ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা

বোধায়ন চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় সামাজিক ও আর্থিক কাঠামোর বিশ্লেষণে মৌলিক মার্কসবাদী
পদ্ধতির প্রয়োগের ঐতিহ্য খুব গভীর বা প্রশস্ত নয় আজও। এ ব্যর্থতা
আমাদের সকলের যে, রজনী পাম দত্ত-র বই-এ প্রারব্ধ বিশ্লেষণকে
স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে ভারতীয় সমাজবিবর্তনের নবতর পটপরিবর্তনের
সামগ্রিক মূল্যায়নে গ্রথিত করতে পারা যায় নি আজও। গেল দশ বছর
যাবৎ কোনোরকম দীর্ঘমেয়াদী মার্কসবাদী কার্যক্রমের অভাবই সে ব্যর্থতার
অনস্বীকার্য রাজনৈতিক প্রমাণ। সে দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম রচনায় সামাজিক
ও আর্থিক কাঠামোর বিভিন্ন অংশের যে সহিষ্ণু পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ-প্রচেষ্টা
প্রয়োজন, তাতে শ্রীভবানী সেন-এর এই সর্বশেষ বইটি* উল্লেখযোগ্য
ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ভারতবর্ষে মার্কসবাদী রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে শ্রীভবানী সেন বরাবরই কৃষিব্যবস্থার আলোচনায় তৎপর। তবে এর আগে কৃষিব্যবস্থা বিষয়ে তাঁর যে তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে, তার সঙ্গে আলোচ্য বইটির পার্থক্য মৌলিক। এই বইটিতেই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের কৃষি সমস্যার আলোচনায় মার্কস ও লেনিন নির্দেশিত মৌলিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। তাঁর সব কয়টি সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হওয়ার অবকাশ থাকলেও, বিশ্লেষণ পদ্ধতির দিক থেকে এ বই-এর অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য। অনগ্রসর কৃষি ব্যবস্থার বিচারবিশ্লেষণে আমাদের দেশের মার্কসবাদী মহলের আলোচনা, সাধারণত, কয়েকটি মামূলী সূত্র আপ্তবাক্যের মতো জপ করে চলার দরুণ, বস্তাপচা বুলির একঘেয়েমিতে পর্যবসিত হতে বসেছিল। আলোচ্য বইটিতে শ্রীসেন সেই বাঁধাধরা ছককে সবলে অতিক্রম করেছেন। তাই,

---

*Bhowani Sen. Evolution of Agrarian Relations in India. P.P.H. Rs. 8'50-

বর্তমান আলোচনায় আমরা তাঁর সিদ্ধান্তগুলি অপেক্ষা বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিশেষত্বর দিকে প্রথমে পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

মার্কস ও লেনিন নির্দেশিত পথে যে ক-টি নতুন ধারণা বা প্রতিমানের অবতারণা তিনি করেছেন সেগুলি নিম্নরূপ :

১ এ যাবৎ ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার আলোচনায় মার্কসীয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির ধারায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তনটি শ্রীসেন আনয়ন করেছেন সেটি হলো সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মার্কস ও লেনিন নির্দেশিত 'দুই পথ'-এর ধারণার প্রয়োগ। 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথমখণ্ডে আইরিশ প্রজাস্বত্ব সংস্কারের আলোচনায় ও তৃতীয় খণ্ডে মার্কস ধনতান্ত্রিক বিকাশের যে 'দুই পথ'-এর নিশানা দিয়েছিলেন, Agrarian Programme of Social Democracy-র আলোচনায় লেনিন সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এবং সেই বিশ্লেষণেরই সূত্র ধরে অক্টোবর বিপ্লবের কৃষি-কার্যক্রম রচিত হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেসের কৃষিসংস্কার নীতির মূল্যায়ণে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক বিকাশের গতিপ্রকৃতি বিচারে এই প্রথম সর্বভারতীয় মার্কসবাদী নেতৃত্বের লেখায় লেনিনের সেই 'দুই পথ'-এর ধারণা গৃহীত ও প্রযুক্ত হলো। ইতিমধ্যে অবশ্য 'Science and Society' পত্রিকায় Dobb, Takahasi, Sweezy ইত্যাদির সেই সুবিখ্যাত আলোচনাটির দৌলতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের দুই পথের ধারণাটির কিছুটা বহুলপ্রচার ঘটেছে।

২ উক্ত 'দুই পথ'-এর পদ্ধতি প্রয়োগের সূত্রে শ্রীসেন খুবই সাহসের সঙ্গে এদেশের মার্কসবাদী আলোচনার একটি অন্যতম বাঁধাধরা ছককে বর্জন করেছেন। কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের মূল্যায়ণে শুধুমাত্র কৃষিমজুরের সংখ্যা বা অনুপাতকেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাটা আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। শ্রীসেন ভূমিকাতেই স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কৃষিমজুরি প্রথার বিকাশকে ধনতান্ত্রিক বিকাশের একটি শর্ত হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করাটা যেমন ভুল, সেটাকেই একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষণ মনে করাটাও তেমনি ভুল।

৩ অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে লেখক 'ক্যাপিটাল' তৃতীয় খণ্ডে Small-Peasant Economy বা ছোট চাষীর কৃষিব্যবস্থার যে অধ্যায়টি আছে, স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের কৃষিব্যবস্থার বিচারে সেই অধ্যায়টির মূল ধারণাগুলির সৃজনশীল ব্যবহার করেছেন। সরকারী নীতির ফলাফল নির্ণয়ে ইদানীং মার্কসবাদী

মহলে দু-ধরনের অতিশয়োক্তির ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। প্রথমটি প্রধানত মার্কসবাদ-ঘেঁষা অর্থনীতির ছাত্র ও গবেষকদের মধ্যে দেখা যায়। দ্বিতীয়টি মার্কসবাদী রাজনীতিকদের মধ্যে। প্রথমোক্ত ধারার ঝোঁক হলো ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিতে মূলত ধনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ও ধনতান্ত্রিক উদ্যোগের—Entrepreneurship—প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই কথা বলা। তাঁদের কারোর কারোর মতে কৃষি উৎপাদনের সংকট সমাধানের পথে। দ্বিতীয় মতটির প্রবক্তাদের ধারণা যে বৃটিশ আমলের অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি ; ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা মূলতঃ সামন্ততান্ত্রিকই রয়ে গেছে, উৎপাদনের অবস্থাও তথৈবচ। শ্রীসেন সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে বিবর্তনের মধ্যবর্তী অবস্থায় transitional small peasant economy, অন্তর্বর্তীকালীন ছোট চাষীর কৃষিব্যবস্থার মার্কস-কথিত তত্ত্বের প্রয়োগে গত দশকের ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার বিবর্তনের মূল্যায়ণে একটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। এই small-peasant economy কোন দিকে মোড় ঘুরবে তা উক্ত 'দুই পথ'-এর দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তির উপর নির্ভরশীল।

৪ ধারণাটা নতুন না হলেও, স্পষ্টভাবে ও সঠিক পটভূমিতে শ্রীসেন মৌলিক মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বৃটিশ আমলে ভারতীয় কৃষিতে মুদ্রা ও বাজারের অনুপ্রবেশ ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ না ঘটিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই প্রাক্‌ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ককে কঠোরতর ও তীব্রতর করেছে। 'দুই পথ'-এর বিকাশ-প্রক্রিয়ায় মুদ্রা ও বাজারের এই উল্টোরথ যাত্রার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। মুদ্রা ও বাজারের অনুপ্রবেশকে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সমার্থক মনে করাটা শুধু যে বুর্জোয়া অর্থনীতিরই ধরতাই বুলি তাই নয়, অনেক সময়ে মার্কসবাদী মহলেও এইরকম ধারণার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে।

৫ মার্কসীয় খাজনাতত্ত্বে যে প্রশ্নটা খুবই জটিল সেটা হল absolute rent, জমাওয়ারি ও differential rent, দফাওয়ারি খাজনার মধ্যে পার্থক্য ও সেই পার্থক্য নির্ণয়ের সূত্রে ধনতান্ত্রিক বিকাশের স্তরনির্ণয়। বর্তমান লেখকের মতে শ্রীসেন ১২৬ পৃঃতে লেনিনের যে উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রাক্‌ধনতান্ত্রিক খাজনা ও ধনতান্ত্রিক খাজনার মধ্যে তফাৎ করেছেন, রাজনৈতিক কার্যক্রম নির্ণয়ের সেইটাই প্রকৃষ্ট উপায়। ভূমির একচেটিয়া মালিকানার অবসান ও পরিশেষে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণতি, এই খাজনা-

তত্ত্বের দিগ্‌দর্শন। তবে, absolute rent-এরও আবার প্রকারভেদ আছে। এ কথা ঠিকই যে, absolute rent-এর অবলোপই গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের আর্থনীতিক উপাদান। কিন্তু, ধনতান্ত্রিক বিকাশের স্তরনির্ণয়ে absolute rent-এর প্রকারভেদের প্রশ্নটা ওঠে। ভূমির একচেটিয়া মালিকানা থেকে যে absolute rent-এর উৎপত্তি, কৃষিজাতপণ্যের বাজারদরে উৎপাদন-মূল্যের (Price of Production) উপরি উদ্বৃত্ত থেকে যার উৎপত্তি, সেই জাতীয় absolute rent একেবারে ধনতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থাতেও বর্তমান। আবার কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির আপেক্ষিক অনগ্রসরতা থেকে একপ্রকার absolute rent-এর উৎপত্তি ঘটে যেটাকে আমাদের দেশের মতো প্রাক্‌ধনতান্ত্রিক অন্তর্বর্তীকালীন কৃষিঅর্থনীতির বিশ্লেষণে প্রয়োগ করা সম্ভব। শ্রীসেন সেই আলোচনায় প্রবেশ করলে উৎপাদন পদ্ধতির অনগ্রসরতার যে বৈশিষ্ট্য তিনি বরাবরই লক্ষ্য করেছেন, সে বৈশিষ্ট্যকে মার্কসীয় খাজনাতত্ত্বের বিশ্লেষণী কাঠামোর অঙ্গাঙ্গী করে তুলতে পারতেন। তাহলে small peasant economy-র তত্ত্ব খাজনাতত্ত্বের সঙ্গে মিলে গিয়ে তাঁর বিশ্লেষণী কাঠামোর একটা পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক বনিয়াদ রচনা করে দিত।

এ পর্যন্ত শ্রীসেন-এর বিশ্লেষণপদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত অলোচনা করা গেল। এইবার তাঁর প্রধান সিদ্ধান্তগুলির একটা সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যাক। তাঁর আলোচনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) ইংরেজ আসার আগে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা, (২) ইংরেজ আমলে কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তনের আলোচনা, এবং (৩) স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে পরিবর্তনের মূল্যায়ণ ও গতিপ্রকৃতিনির্ণয়।

প্রথম দুটি পর্যায়ের আলোচনায় বিশেষ নতুনত্ব কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজপূর্ববর্তী আমলের কৃষিব্যবস্থার আলোচনায় মার্কসের 'Articles on India,' ব্যাডেন পাওয়েল, রাধাকুমুদ মুখার্জি, কোশাম্বি ইত্যাদির আলোচনার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া আর কিছু তিনি দেন নি। দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা রজনী পাম দত্ত-র বই ও তৃতীয় দশকের সেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার বিখ্যাত স্মারকলিপি বা অভয়চরণ দাশের বই-এর চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। বিশেষত্বটুকু আমরা পদ্ধতির আলোচনায় ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি উপরের ৪নং অনুচ্ছেদে। সবচেয়ে বেশি বিতর্কমূলক ও সবচেয়ে বেশি মৌলিক তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা।

গত দশকের পরিবর্তনের মূল্যায়ণে তাঁর প্রধান সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপ :

১ ভারতীয় কৃষি-সংস্কারের রাজনৈতিক আকাশে 'দুই পথ'-এর লড়াই বেধেছে। পরিকল্পনা কমিশনের Panel of Land Reforms-এর প্রস্তাব '১নং পথ' বা ধনী ও মাঝারি কৃষকনির্ভর গণতান্ত্রিক সংস্কারের পথ। অন্যদিকে স্বতন্ত্র পার্টি, জনসংঘ ও কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাববিরোধী অংশের মতামত '২নং পথ'-এর পক্ষে; অর্থাৎ, তাঁরা বড় জোতের মালিকের উপর নির্ভর করে ধনতান্ত্রিক বড় খামার সৃষ্টির পক্ষে। সরকারি নীতি এই দুই পথের মাঝখানে চরে বেড়াচ্ছে।

২ ফলে, প্রকৃতপক্ষে ভারতের কৃষিব্যবস্থায় ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, নিজচাষের প্রাদুর্ভাব ব্যাপক প্রাধান্য লাভ করেছে; কিন্তু, নিজ-চাষী বলতে আজ ভারতবর্ষে খেটে খাওয়া কৃষক, মজুর লাগিয়ে আবাদ করে এমন জোতের মালিক, এমনকি এক ধরনের প্রজানির্ভর জমিদারও একাকার হয়ে গেছে। 'নিজচাষ'-এর যে তাজ্জব সব সংজ্ঞা ভারতীয় ভূমিসংস্কার আইনে গৃহীত হয়েছে তারই ফলে এইরকম ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, সামন্ত ভূম্যধিকারী (Feudal latifundia) বা অতিকায় ধনতান্ত্রিক খামারের বদলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসংখ্য পারিবারিক জোতই কৃষিব্যবস্থার প্রধান অংশ। তৃতীয়ত, ভাগচাষী বা নিকৃষ্ট প্রজার তুলনায় ক্ষেতমজুরের সংখ্যাই ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তার করছে।

৩ আনুমানিক এক-চতুর্থাংশ জমিতে প্রধানত ক্ষেতমজুর-নির্ভর চাষের প্রবর্তন ঘটেছে, এবং কৃষিমজুরশ্রেণীর শতকরা ৪০ ভাগ এই ধরনের খামারে নিযুক্ত, যাকে প্রকৃত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন বলা যায়। কিন্তু এই অংশের উৎপাদন পদ্ধতিও অনগ্রসর। এমনকি অনেক সময়ে ছোট জোতের চেয়েও নিকৃষ্ট। যন্ত্রপাতি ট্রাক্টর ইত্যাদির ব্যবহার খুবই নগণ্য, শতকরা এক ভাগ জমিতেও ব্যবহার হয় কিনা সন্দেহ।

৪ এর ফলে কৃষিউৎপাদনের সংকট কোনো মৌলিক সমাধানের পথ ধরতে পারছে না। কৃষিব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ পুঁজিসঞ্চয়ের পথ বন্ধ হয়ে থাকছে। বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি কৃষির বাইরে থেকে আমদানি করতে হচ্ছে।

এই সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, একদিকে ভূমিসংস্কার আইনের নানা ফাঁক দিয়ে সহরবাসী জমিদারদের গলে বেরিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে আইনের আমলাতান্ত্রিক প্রয়োগে যতটা সম্ভব

ধনী কৃষক ও জমিদারদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে সামন্ততন্ত্র অটুট থাক এ কথাও যেমন বলা যায় না ; তেমনই প্রাক্‌শিল্পবিপ্লবযুগের ইংলণ্ড আমেরিকার কৃষিতে যে দ্রুত ধনতান্ত্রিক বিকাশ সাধিত হয়েছিল সে-রকম কো পরিবর্তন হচ্ছে—একথাও বলা যায় না। আসলে এক ধরনের রুগ্নভগ্ন কৃ ধনতন্ত্রেরই ("agricultural capitalism of a rickety type") বিকাশ ঘটছে

বর্তমান লেখক তাঁর সিদ্ধান্তের মূল ধারার সঙ্গে একমত। তবে কয়ে জায়গায় সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রমাণের ব্যাপারে আপত্তি আছে। যেমন, এ জায়গায় তিনি বলছেন, গত দশকে প্রধানত ক্ষেতমজুর-নির্ভর খামারগুলি নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা শতকরা ৫ থেকে ২১-এ পরিণত হয়েছে। প্রথম শতকরা ৫-এর হিসেবটা ডঃ প্যাটেল করেছেন ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট তথ্যের ভিত্তিতে ; ১৯৫১ সালের তথ্যের ভিত্তিতে নয়। দ্বিতীয়ত, প্যাটেলের সে হিসেব এতই আন্দাজি ব্যাপার যে তা থেকে বাড়তি কমতির কোনো সিদ্ধান্ত করা চলে না। এইরকমই আরও একটা উদাহর হলো জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ১০নং রিপোর্টের ভিত্তিতে ইজারাকৃত জমি হিসাব। ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার বিষয়ে সাম্প্রতিক সব সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব ভূমিসংস্কার আইনজনিত response-bias এর শিকার। এ কথাটা মনে রেখে এইসব রিপোর্ট ব্যবহার করা উচিত। এই কারণে, বর্তমান লেখকে মতে শ্রীসেন-এর নিজচাষের ব্যাপকতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত—অর্থাৎ জমির শতকর আশিভাগের উপরই নিজচাষপ্রথা চালু রয়েছে—সন্দেহজনক। ঠিক এ ধরনের একটা সিদ্ধান্তের বিষয়েই ডঃ ড্যানিয়েল থর্নার মন্তব্য করেছিলেন "agrarian revolution by census redefinition" ! এ ছাড়া কোনো কোনো Table-এর ব্যাখ্যায় ছোটখাট ভুলও আছে।

বইটির প্রধান দুটি দুর্বলতার কথাও বলা দরকার। প্রথমত, সমগ্র ভূমিসংস্কার আইনের আলোচনার শেষে একটি সত্যই বেরিয়ে আসে যে, গেল দশবছরের আইনের বন্যায় ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার মৌলিক সংকটমোচন ঘটে নি। নাগপুর প্রস্তাবও একটা ছেঁড়া কাগজে পরিণত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে উক্ত আইনগুলির বিষয়ে কৃষকআন্দোলনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে? সমস্ত ভূমিসংস্কার আইনের আমূল সংশোধনের প্রশ্নকেই কি আবার জাতির সমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন? দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী মহলে যে non-capitalist path, অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ সম্পর্কিত চিন্তা আবর্তিত হচ্ছে ; তার সঙ্গে প্রাগুক্ত 'দুই পথ'-এর দ্বন্দ্বের যোগাযোগ কোথায়? ছোটচাষীনির্ভর কৃষিব্যবস্থার দিক্‌নির্ণয়ে ও রুগ্ন ধনতান্ত্রিক বিকাশের পর্যায়ে সমগ্র কৃষকসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার কার্যক্রম নির্ণয়েই বা উক্ত non-capitalist path-এর ধারণার কী ভূমিকা? এ প্রশ্নগুলিকে লেখক এড়িয়ে গেছেন।

প্রকাশকেরা প্রচ্ছদপটের ব্যাপারে যতটা নজর দিয়েছেন, ছাপাখানার শয়তানের উপর ততটা কড়া পাহারা বসাননি।

শিল্পের অভিজ্ঞতা

বিষ্ণু দে

বহুকাল অপেক্ষার পরে অবনীন্দ্রনাথের এই উপাদেয় প্রবন্ধ পুস্তক* যে পড়তে পেলুম তার জন্য রূপা কোম্পানি-কে অনেক ধন্যবাদ। আটাশটি বক্তৃতা প্রবন্ধের এই বইটি দেখা যাচ্ছে এখনও তার প্রসঙ্গমূল্য কিছুমাত্র হারায় নি। শিল্পতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্বের সমস্যা উন্মোচনে অবনীন্দ্রনাথের চিন্তা এখনও আমাদের মধ্যে পরিপাকজীর্ণ হয় নি, এখনও মননকে জাগাবার ক্ষমতা এই বক্তৃতাবলী সময়াপহৃত হয় নি কিছুমাত্র। এবং শিক্ষনীয়তা ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথের রচনা স্বকীয় সাহিত্যগুণে আজও সমান আনন্দদায়ক। আবার দেখা গেল যে এই বাংলার অসাধারণ গদ্যশিল্পী বিষয়নির্দিষ্ট বক্তৃতার মধ্যেও তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভাকে একটুও ব্যাহত হতে দেন নি। যে মনীষী 'বাংলার ব্রত'-র মতো যুগান্তকারী সমাজতত্ত্বের আবিষ্কারগ্রন্থ লেখেন ; আবার প্রথাসিদ্ধ ভারতশিল্পের আলোচনাতেও যিনি প্রায় পথপ্রদর্শক—প্রায়, কারণ রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে লিখেছিলেন ; 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'ভূতপত্‌রীর দেশ', 'নালক', 'বুড়ো আংলা', 'পথে বিপথে' প্রভৃতির মতো অতুলনীয় বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টিও যাঁর কীর্তি ; এই বক্তৃতামালাও শুধু তাঁরই পক্ষে রচনা সম্ভব ছিল। তা সে নিছক শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে হোক, বা আর্য ও অনার্য সম্বন্ধবিচারেই হোক।

শিল্পের অভিজ্ঞতা ও শিল্পের জ্ঞান যেমন এই বইটিতে আজও আশ্চর্য করবে, তেমনি তাঁর মনের সম্পূর্ণতা, চোখকানহৃদয় সবকিছুর মানবিক প্রখরতা পাঠককে জাগ্রত করে এই প্রবল গদ্যের কথ্য ছন্দে।

সমালোচকের পক্ষে এই বই বিষয়ে বেশি বলা এক্ষেত্রে ধৃষ্ট বাহুল্য মাত্র। যে কোনো পাঠক যে কোনো পৃষ্ঠাতেই থমকে যাবেন অবনীন্দ্রনাথের অন্বেষী ভাবনাচিন্তায়, তাঁর লিখনের গভীরতায়, তার বাহারে, কারণ :

*বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী। রূপা। বারো টাকা।

"এই খোঁজাতেই শিল্পীর মজা। এই মজা থেকে কাউকে বঞ্চিত করবার ইচ্ছা আমার একেবারেই নেই।"

অথবা আমাদের দুর্দশা বিষয়ে আজও প্রাসঙ্গিক চাবুক: "অন্নেই মন ভরে গেলো যেমন-তেমনে! শুধু অন্ন হলে তো কথা ছিল না; সেটা বিশ্রী হবে কেন? মাসে বার-পঁচিশ বায়স্কোপ-রঙ্গমঞ্চের রঙ্গ এবং ফুটবলের ভিড়, ঘোরদৌড়ের জুয়ো এবং দু-চারটে স্মৃতি-সভার বার্ষিক অধিবেশন ও যতটা পারা যায় বক্তৃতা—এই হলেই কি চুকে গেলো সব ক্ষুধা, সব তৃষ্ণা? ধর ক্ষুধা মেটানো গেলো—সোনালী গিল্টি-করা মার্বেল-মোড়া বৈদ্যুতিক আলোতে ঝকমক হোটেলের খানা-কামরায়, এবং তৃষ্ণা মেটালেম মদের বোতলে; কিন্তু তারপরে কি? মনের খোরাক যে মধু, মনকে তা দেওয়া হল না—পেয়ালা ভরে। মন রইলো উপবাসে। দিনে-দিনে মন হতবল, হতশ্রী হল, স্ফূর্তি হারালে। তারপর একদিন দেখলেম, আনন্দময়ের দান-আনন্দ দেবার ক্ষমতা আনন্দ পাবার ইচ্ছা—সবই হারিয়েছি; সৌন্দর্যবোধ, আনন্দবোধ—সবই আমাদের চলে গেছে। বাতাস যে কি বলছে তা বুঝতে পারছিনে, ফুলন্ত পৃথিবী কি সাজে যে সেজে দাঁড়াচ্ছে ঘরের সামনে তাও দেখতে পাচ্ছিনে। আকাশে আলো নেই অন্তরে তেজ নেই আশা নেই আনন্দ নেই শুকনো জীবন ঝুঁকে রয়েছে রসাতলের দিকে! এটা যে আমি অযথা বাগ্‌জাল বিস্তার করে ভয় দেখাচ্ছি তা নয়; এই ভয় সত্যিই আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই ভয় থেকে পরিত্রাণের উপায় করতেই হবে,—শিল্পীর অধিকার আমাদের পেতেই হবে, না হলে কিছুই পাব না আমরা। ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার শিল্পভাণ্ডার অতুল ঐশ্বর্যে কালে-কালে ভর্তি হল সত্যি, কিন্তু আজকের আমাদের হালচাল দেখে কেউ কি বলবে আমরাই সেই অফুরন্ত ভাণ্ডারের যথার্থ উত্তরাধিকারী? এই হতশ্রী নিরানন্দ অত্যন্ত অশোভনভাবে নিঃস্ব, কেবলি হাত-পাতা আর হাত-জোড়া ছাড়া হাতের সমস্ত কাজ যারা ভুলে বসেছি, সূর্যের কণা-দিয়ে-গড়া কোণার্ক মন্দির, প্রেমের স্বপন-দিয়ে-ধরা তাজ—এগুলো কি আমাদেরই? ভারতবাসী বলেই কি এগুলো আমাদের হল? তা তো হতে পারে না। এই সব শিল্পের নির্মিতি, এদের নিজেদের বলবার অধিকার অর্জন করবো শুধু সেই দিন, যেদিন শিল্পকে আমরা লাভ করবো, তার পূর্বে তো নয়। শিল্প যেদিন আমাদের হবে, সেদিন জগৎ বলবে এ সবই তো আমাদের! আমাদের শিল্পও তোমাদের। আমাদের দেশের

রসিকরা বলেছেন শিল্পকে 'অনন্যপরতন্ত্রা'। শিল্পের সাধনা যে করে, কি দেশের কি বিদেশের প্রাচীন নতুন সব শিল্পের ভোগ তারই কপালে ঘটে। আমার দেশ বলে ডাক দিলে দেশটা হয়তো বা আমার হতেও পারে কিন্তু দেশের শিল্পের উপরে আমার দাবি যে গ্রাহ্য হবেনা, সেটা ঠিক। তা যদি হত তবে কালাপাহাড় থাকলে, সেত আজ আমাদের সঙ্গে ভারতশিল্পের চূড়া থেকে প্রত্যেক পাথরটির উপরে সমান দাবি দিতে পারতো; কেননা কালাপাহাড় ছিল ভারতবাসী এবং আমাদেরই মতো ভাঙতে পটু, গড়তে একেবারেই অক্ষম; শুধু, কালাপাহাড় ভেঙে গেছে রাগে আর আমরা ভাঙছি বিরাগে—এইমাত্র তফাৎ। কাব্যকলা শিল্পকলা গীতকলা,—এ সবাইকে 'রস-রুচিরা' বলে কবিরা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হ্লাদৈকময়ী—আনন্দের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছেন; আর তিনি অনন্যপরতন্ত্রা—যেমন-তেমন যার-তার কাছে তো তিনি বাঁধা পড়েন না; রসিক, কবি—এদেরই তিনি বরণ করেন এবং এদেরই তিনি সহচরী সঙ্গিনী সবই। আমরা যারা এক আফিসের কাজ এবং শেয়ারের কাজ ও তথাকথিত দেশের কাজ প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পাইনে রস পাইনে পাবার চেষ্টাও করিনে, তাদের কাছ থেকে শিল্প দূরে থাকবেন, এতে আশ্চর্য কি? "অলসস্য কুতো শিল্পং অশিল্পস্য কুতো ধনং!"

"নিজের শিল্প থেকে ভারতবাসী হলেও আমরা কতখানি দূরে সরে পড়েছি এবং বিদেশী হলেও তারা এই ভারতশিল্পের রত্নবেদীর কতখানি নিকটে পৌঁছে গেছে তার দুটো-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। জাপানের শ্রীমৎ ওকাকুরা শেষবার এদেশে এলেন, শক্ত রোগে শরীর ভগ্ন কিন্তু শিল্পচর্চা রসালাপের তাঁর বিরাম নেই। সেই বিদেশী ভারতবর্ষের একটি তীর্থ দেখতে এসেছেন—দূর প্রবাস থেকে নিজের ঘরের মৃত্যুশয্যায় আশ্রয় নেবার পূর্বে একবার জগন্নাথের মন্দিরের ভিতরটা কেমন শিল্পকার্য দিয়ে সাজানো দেখে যাবেন এই তাঁর ইচ্ছা, আর সেই কোণার্ক মন্দির যার প্রত্যেক পাথর শিল্পীর মনের আনন্দ আর আলো পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেটাও ঐ সঙ্গে দেখে নেবার তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ দেখলেম। জগন্নাথের ডাক পড়েছে আমার বিদেশী শিল্পী-ভাইকে; কিন্তু জগন্নাথ ডাকেন তো ছড়িবরদার ছাড়ে না, ভারতের বড়লাটকে পর্যন্ত বাধা দেয় এত বড় ক্ষমতা সে ধরে! তাকে কি ভাবে এড়ানো যায়? শিল্পীতে শিল্পীতে মন্ত্রণা বসে গেলো। চুপি-চুপি পরামর্শটা হল বটে কিন্তু বন্ধু গেলেন

জগবন্ধু দর্শন করতে দিনের আলোতে রাজার মতো। এইটেই ছিল বিশ্ব-শিল্পীর মনোগত ;—শিল্পী বিদেশী হলেও তার যেন গতিরোধ না হয় দর্শনের দিনে। দ্বার খুলে গেলো, প্রহরী সসম্মানে একপাশ হল, জাপানের শিল্পী দেখে এলেন ভারতের শিল্পীর হাতে-গড়া দেবমন্দির, বৈকুণ্ঠ, আনন্দবাজার, মায় দেবতাকে পর্যন্ত। এই পরমানন্দের প্রসাদ পেয়ে বন্ধু দেশে চললেন অক্ষত শরীরে। তাঁর বিদায়ের দিনের শেষ-কথা আমার এখনও মনে আছে—ধন্য হলেম আনন্দের অবধি পেলেম, এইবার পরপারে সুখে যাত্রা করি। এই তো গেলো শিল্পের যথার্থ অনুরাগী অথচ বিদেশীর ইতিহাস। এইবার স্বদেশী অথচ বিরাগীর কথাটা বলি। ঐ জগন্নাথের মাসির বাড়ির জীর্ণ সংস্কার করতে হবে। একটা কমিটি করে খানিকটা টাকা তোলা হয়েছে ; এস্টিমেট বক্তৃতা ইত্যাদি হয়ে ঠিক হয়েছে—অনেক কালের পুরোনো বনগাঁবাসী মাসির ঘরের বেশ কারুকার্য-করা পাথরের বড় বারাণ্ডা, কাল যেটাতে বেশ একটু-খানি চমৎকার গাঢ় বর্ণের প্রলেপ দিয়েছে, আর যার নানা ফাটলের শূন্যতাগুলো মনোরম হয়ে উঠেছে বনলতার সবুজ আর সোনায়, সেই পুরোনোটাকে আরো পুরোনো—আরো মনোরম হতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি সেটার এবং সেই সঙ্গে মন্দিরের মধ্যেকার কতকালের লেখা শঙ্খলতার পাড় হংসমিথুনের ছবি ইত্যাদি নানা আল্‌পনা নক্সাখোদকারী কারিগরি দেওয়াল হতে কড়ি বরগার যত দাগা ও আঁটা ছিল সবগুলোর একসঙ্গে গঙ্গাযাত্রা করা। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলেম মন্দির সংস্কার হচ্ছে। মাসির বাড়িতে প্রাচীন মূর্তির শিলাবৃষ্টি হয়ে গেছে, হরির লুটের বাতাসার মতো যত পার কুড়িয়ে নিলেই হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি-চুপি সেখানে গিয়ে দেখি একটা যেন ভূমিকম্প হয়ে গেছে, চুড়োর সিংহি উল্টে পড়েছে ভূঁয়ে, পাতালের মধ্যে যে ভিৎ শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়েছিল এতকাল, সে শুয়ে পড়েছে মাটির উপরে ; সব ওলট-পালট, তছনছ! কেমন একটা ত্রাস উপস্থিত হল। চরকে শুধালেম—এই সব পাথরের কাজ ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে যেমন ছিল তেমনি করে তুলে দেওয়া হবে তো সংস্কারের সময়ে? চরের কথার ভাবে বুঝলেম এইসব জগদ্দল পাথর ওঠায় যেখানকার সেখানে—এমন লোক নেই। বুঝলেম এ সংস্কার নয়, সৎকার। ভাঙা মন্দিরে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে একজোড়া প্রকাণ্ড নীল হরিণ চার চোখে প্রকাণ্ড একটা বিস্ময় নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলো। কতকালের পোষা হরিণ,

এই মন্দিরের বাগানে জন্ম নিয়ে এতটুকু থেকে এত বড়টি হয়েছে,—এদের কি হবে? শুধিয়ে জানলেম এদের বিক্রী করা হবে, আর এদের সঙ্গে-সঙ্গে যে বাগিচা বড় হতে-হতে প্রায় বন হয়েছে—বনস্পতি যেখানে গভীর ছায়া দিচ্ছে পাখি যেখানে গাইছে হরিণ যেখানে খেলছে সেই বনফুলের পরিমলে-ভরা পুরোণো বাগিচাটা চষে ফেলে যাত্রীদের জন্য রন্ধনশালা বসানো হবে। আমার যন্ত্রণাভোগের তখনও শেষ হয়নি—তাই ডবল তালা-দেওয়া ঘর দেখিয়ে বললেম—এটাতে কি? পাণ্ডা আস্তে-আস্তে ঘরখানা খুললে, দেখলেম মিণ্টন আর বরন কোম্পানির টালি দিয়ে অত বড় ঘরখানা বোঝাই করা। ভাণ্ডার মধ্যে—ধ্বংসের স্তূপে, রস আর রহস্য, নীল দুটি হরিণের মতো বাসা বেঁধে ছিল—সেই যে শোভা, সেই শান্তি মনে ধরল না আমাদের। ভাল ঠেকল দুখানা চকচকে রাঙামাটির টালি।"

"শিল্পে অধিকার জন্মালো না, চুপ করে বসে থাকা গেল—ঘেঁটে-ঘুঁটে যা পেলাম তাই নিয়ে, সে ভাল। কিন্তু হঠাৎ মনে হল শিল্প-সংস্কার করতে হবে কিংবা দ্বিতীয় একটা অজন্তা-বিহার কিংবা তাজমহলেরই একটা inspiration-এর চোটে অম্বলশূলের বেদনার মতো বুকের ভিতরটা জ্বলে উঠলো, অমনি লাঠিমের মতো ঘুরতে লেগে গেলাম বোঁ-বোঁ-শব্দে শিল্প-সংস্কার, শিল্পের foundation stone স্থাপনের কাজে—এ হলেই মুস্কিল! যে ঘোরে তার ততটা নয়, কিন্তু শিল্প যেটা আমাদের পড়ে রয়েছে এবং মানুষ যারা চুপচাপ রয়েছে নিজের ঘরে, তাদেরই ভয় আর মুস্কিল তখন! Inspiration অমন হঠাৎ আসে না! মনাগুনের জ্বালায়, অম্বল-শূলের জ্বালায় ভেদ আছে। শিল্পজ্ঞানের প্রদীপ হঠাৎ inspiration পেয়ে অমন রোগের জ্বালার মতো জ্বলে না, কাউকে জ্বালায়ও না, আগুন ধরিয়ে দিতে হয় সাবধানে—স্নেহ-ভরা প্রদীপে, তবেই আলো হয় দপ্‌ করে। একেই বলে inspiration।"

"চুলোয় যাকগে inspiration! সাধনা অর্জনা ওসবে কি দরকার? টাকা ঢাললে বাঘের দুধও মেলে, শিল্প মিলবে না? কেনো ছবি মূর্তি, বসাও মিউজিয়াম ; খুলে দাও জাতীয় শিল্পের চেয়ার ; সেখান থেকে তাপমান-যন্ত্রে প্রত্যেকের রসের উত্তাপের ডিগ্রি মেপে দেওয়া হোক ডিপ্লোমা, Library হোক রসশাস্ত্রের ; স্কুল হোক—সেখানে বয়স্ক ছেলেরা চিত্রকারি খোদকারি নানা কারিগরি শিখতে ; লিখতে লেগে যাক বড়-বড় 'থিসিস' শিল্পের উপরে ;

ছাপা হয়ে চলে যাক সেগুলো ইংরাজীতে বিদেশে। আকাশের চাঁদকে প ধরা যায় এমন বিরাট আয়োজন করে বসা যাক, শিল্প সুড়-সুড় করে আপ আসবে। হায়, যে শিল্প বাতাসের ফাঁদ পেতে আকাশের চাঁদকে সত্যি ধরে এনে খেলতে দিচ্ছে মানুষকে, তাকে তলব দেবো এমনি করে? হুজুরে তলব মজুরের উপরে? আর সে এসে হাজির হবে দুয়োরের বাইরে জু রেখে দু হাত সেলাম ঠুকতে-ঠুকতে?"

"আমেরিকা তার কুবের ভাণ্ডার খুলে দিয়ে পৃথিবীর শিল্পসামগ্রী নতু পুরাতন সমস্তই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেলো নিজে বাসায়। সেখানে সংগ্রহের বিরাট আয়োজন, চর্চারও বিরাট-বিরাট বন্দোব হাঁকডাকও বিরাট; কিন্তু সেখানে কল হল, কারখানা হল, আকাশ-প্রমা সব বাড়ি, যোজন-প্রমাণ সব সেতু আর বাঁধ উঠে বেঁধে ফেললে নায়াগ্র নির্ঝর; কিন্তু সেই আয়োজনের পাহাড় এত উঁচু যে তার ওপারে কোথা যে শিল্পীর আনন্দের নির্ঝর ঝরছে তা জানাই মুস্কিল হয়েছে তাদের—যার আয়োজন করলে এত করে শিল্পকে জানতে! একথা আমার এক আমেরিকান বন্ধু জানিয়ে গেছেন—আমি বলছিনে।"

নিশ্চয়ই আমরা আশা করব রূপা কোম্পানি অবনীন্দ্রনাথের দুষ্প্রাপ বইগুলি এবং লেখাগুলি তাঁর উপযুক্ত দুই দৌহিত্র শ্রীযুক্ত মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে প্রকাশ করবেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত : কয়েকটি দিক

হীরেন চক্রবর্তী

রবীন্দ্রসঙ্গীতের লোকপ্রীতিবৃদ্ধির ফলস্বরূপ তার একটা আলোচনা-সাহিত্যও ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে*। এই আলোচনার মুখ্য প্রতিপাদ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক প্রত্যয় এবং বাংলা কাব্য-সঙ্গীতের ভাণ্ডারে তাঁর নিজস্ব দানও কোনো কোনো আলোচনার বিষয়ীভূত। এই আলোচনার সূত্রপাত বর্তমান শতকের প্রারম্ভে সূচিত হয়ে থাকলেও শতবার্ষিকী উপলক্ষে তা বহুল বিস্তৃতি লাভ করেছে। স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশনা ছাড়া, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য আলোচনার সম্মিলিত কলেবরও নেহাৎ ক্ষীণ হবে না। শতবার্ষিকীর রবীন্দ্রচর্চার মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতবিষয়ক এই চর্চাকেও বিশেষভাবে নামাঙ্কিত করা চলে। শতবার্ষিকী বছরে রবীন্দ্রসান্নিধ্যপ্রাপ্ত বিবিধজনের যে সকল আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ মাত্র, যে কারণে তার মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তাত্ত্বিক অথবা প্রায়োগিক সংবাদ খুঁজতে গিয়ে পাঠকসাধারণ স্বভাবতই ব্যর্থকাম হয়ে থাকেন। অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর অধ্যাপক অথবা রাগসঙ্গীতের ঐতিহাসিকের রবীন্দ্রসঙ্গীতবিষয়ক প্রবন্ধ থেকে এর বেশি আলোকপ্রাপ্ত হওয়া যায় না যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত সত্যই সঙ্গীত নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং প্রথম শ্রেণীর কবি হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান রবীন্দ্রনাথ সত্যই অর্জন করেছিলেন। অন্যদের আলোচনা পুরাতন সংবাদের পৌনঃপুনিক আবৃত্তি। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গদ্য গান সম্বন্ধে শ্রীবুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের আলোচনা, গদ্য গানের ছন্দ সম্বন্ধে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ এবং শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দারের দুটি

---

*রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নানাদিক। বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়। চার টাকা।

*রবীন্দ্রসঙ্গীত-প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড)। প্রফুল্লকুমার দাস। কালিকলম। সাড়ে তিন টাকা।

প্রবন্ধ ছাড়া 'গীতবিতান'-এর কাব্যকৃতি সম্পর্কে কোনো মৌলিক চি
দৃষ্টিগোচর হয় নি বললে সত্যের ব্যত্যয় ঘটবে না।

শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের রূপকারিণী রূপে স্ব
পরিচিতা। তিনি এবং তাঁর উত্তরার্ধ ইতঃপূর্বে পাঠকসমাজকে 'রবী
সঙ্গীতের ভূমিকা' উপহার দিয়েছিলেন। এই দম্পতির দ্বিতীয় পু
পাঠকদের আগ্রহ বৃদ্ধি করবে সন্দেহ নেই। মোট সাতটি প্রবন্ধ
অবতরণিকায় এই পুস্তিকাটি সমাপ্ত। প্রথম প্রবন্ধে রবীন্দ্রকবিমা
রোমান্টিক এবং মিষ্টিক প্রভাবের রহস্যসন্ধান করা হয়েছে। দ্বিতীয়, তৃ
এবং চতুর্থ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাটকের সঙ্গীত, সম্মেলক গান এবং আনুষ্ঠানি
গান রচনার কিছু কিছু ইতিবৃত্ত পাওয়া যাবে। পঞ্চম প্রবন্ধে গদ্য গা
ঐতিহাসিক বিবর্তনের অনুসরণ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে রুচির প্রশ্ন এবং
প্রবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক বাংলা গানের প্রসঙ্গ আলো
হয়েছে। ষষ্ঠ প্রবন্ধটি কোনো দৈনিকের রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় পাঠ করেছি
এবং যতদূর স্মরণ হয় সেটি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেই প্রকাশিত হয়েছি
বাকি প্রবন্ধগুলির কোনটি কার দ্বারা রচিত তার নির্দেশ পুস্তিকাটিতে নেই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সম্প্রতি যে-সকল সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে প্রত
আলোচনা না থাকলেও পরোক্ষ এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা গ্রন্থকারদ্বয় এ
যেতে পারেন নি। যদিও তাঁরা বলেছেন, "এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্র
কটিতে আমরা প্রমাণ কিছুই করতে চাইনি," তবু বাস্তব সমস্যাগুলির স
তাঁরা শেষ পর্যন্ত নীরব থাকতে পারেন নি এবং এই না-পারা খুবই স্বাভাবি
রবীন্দ্রসঙ্গীতের হিন্দী অনুবাদের বিরোধিতা না করে তাঁরা পারেন নি, যে
তাঁদের মতে, "একথা সকলেই মানেন যে কবিতার অনুবাদে কাব্যের সব
ভাবসম্পদ—তার শব্দমাধুর্য, ধ্বনি চাতুর্য বা মেজাজ রক্ষিত হয়
কাব্যগীতির বেলায় সেটা আরো কঠিন। যে সব ঝোঁক এবং রঙ নি
রবীন্দ্রসঙ্গীত, অনুবাদগীতিতে তা থাকে না।…হিন্দী গান যেমন সক
শেখেন, তেমনি ভারতবর্ষের এক প্রদেশের গান অন্যপ্রদেশের ভাষাভা
পক্ষে শিখে নেওয়া এমন কি কঠিন।"—(পৃঃ ৶০)। বন্দ্যোপাধ্যায় দ
খুবই সমুচিত কথা বলেছেন কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে পুস্তকের পরিচা
শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের বিঘোষিত প্রত্যয়ের বৈপরীত্য পরিদৃশ্যমান।

শিক্ষণের ব্যাপারে হার্মোনিয়মের কুপ্রভাব, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি

বিভিন্ন ঢঙ এবং রীতি গজিয়ে ওঠার সম্ভাবনা এবং তার প্রতিকারের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তোলার যে প্রস্তাব গ্রন্থে করা হয়েছে (পৃঃ ॥০, ॥৵০) তার পিছনে শ্রোতৃসাধারণের সমর্থন থাকলেও স্থিতস্বার্থের দৌলতে শুভবুদ্ধিও যে শেষ পর্যন্ত পণ্ড হবে এমন আশঙ্কার হেতু এই যে, শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে সঙ্গীতভবনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষের এবংবিধ প্রস্তাব কলকাতার কতিপয় প্রভাবিত সঙ্গীতসাংবাদিকের প্রতিকূল প্রচারে শেষ পর্যন্ত কার্যকর হতে পারে নি। গানের এবং স্বরলিপির অহেতুক পরিবর্তনের জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী মাত্রেরই বিব্রত হওয়া স্বাভাবিক। গ্রন্থকারদ্বয়ের এই সব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ৶০ পৃষ্ঠায় "তাই কাঠামোর মধ্যে সামান্যতম এদিক-ওদিক বা সূক্ষ্মতম চ্যুতি হলেই চোখ লাল করাটা বাড়াবাড়ি"—এই মন্তব্য অযৌক্তিক এবং স্ববিরোধী প্রতিভাত হওয়া অসমীচীন নয়। বিচ্যুতির যাঁরা সমালোচনা করেন তাঁদের যৌক্তিকতা এই পুস্তকেরই ৯৭ পৃষ্ঠায় দেখতে পাচ্ছি, "অতুলপ্রসাদের কপালে এই দুঃখ লেখা ছিল। তাই আজ তাঁর গান নানা জনে নানান সুরে আর ভঙ্গিতে গাইছেন। অথচ অতুলপ্রসাদের গানের মর্ম একবার হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই এই ধরণের ভুলভ্রান্তি অসামঞ্জস্য দূর হয়ে যায়।…তা ছাড়া তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যের দল এখনো বর্তমান থাকতে মতভেদ মিটিয়ে নেওয়া তেমন কঠিন বলে মনে হয় না।" অনুমোদিত স্বরলিপি থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের অবস্থা অতুলপ্রসাদের গানের অবস্থায় শনৈঃ শনৈঃ ধাবিত হচ্ছে এবং যে কারণে অতুলপ্রসাদের গানে সুরবিভ্রাট এবং বিকৃতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না, রবীন্দ্রনাথের গানের ব্যাপারে সেই একই ঘটনা ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে। স্বরলিপি সমিতি, গ্রন্থন বিভাগ এবং সঙ্গীতভবনের কার্যকলাপে পারস্পরিক নির্ভরতা এবং সহযোগিতার অভাবে লেখকদ্বয় ৯৮ পৃষ্ঠায় যে মোলায়েম আশা ব্যক্ত করেছেন তা ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কাই সমধিক।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো খেয়াল গানেও কথার মূল্য সম্বন্ধে লেখকদ্বয়ের ধারণা (পৃঃ ৯৫) ভ্রান্ত বুদ্ধিসঞ্জাত প্রতীয়মান হলে পাঠকদের আশা করি তাঁরা ক্ষমা করবেন। আমাদের যতদূর বোধ হয় খেয়ালের গানে কথার অংশ লক্ষ্য নয়—উপলক্ষ। কাব্যার্থ ব্যাখ্যা করার চাকরি খেয়াল গান করে না, রাগ রূপায়ণই তার একমাত্র দায়। তবু রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে লেখকদ্বয় তাঁদের প্রথম পুস্তক থেকে দ্বিতীয়টিতে একটু সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন দেখে

খুশি হওয়া গেল (তুলনীয় : 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিকা'র মন্তব্য—'কণ্ঠবাদিন'
গদ্য গানের বিবর্তন সন্ধান উপলক্ষে তাঁদের উক্তিটি সংবাদ হিসেবে পুরা
হলেও সময়োপযোগী সন্দেহ নেই : "আর তালের বাঁধন-ছাড়া গান হিসে
পেয়েছি 'সখি আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না,' 'অশ্রুভরা বেদনা দি
দিকে জাগে' প্রভৃতি। নমুনা মিলবে অজস্র, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৃহত্তর অং
এই ধাঁচের।

"এইভাবে পুরো গানের চালটাই যখন প্রধান হয়ে উঠল তখন বাণী
বেরিয়ে এল ছন্দমিলের খোলস ছাড়িয়ে ভাবের প্রাঙ্গনে। তখন কাব্যছন্দে
যেমন আর প্রয়োজন রইল না, তেমনি রাগবন্ধ বা তালানুষঙ্গের'ও প্রয়ো
রইল না। সঙ্গীত মুক্তি পেল রসের খোলা সড়কে। তার পরে ছন্দ বিব
তালবিবর্তন প্রভৃতি বহিরঙ্গের বালাই ঘুচিয়ে এসে হাজির হল গদ্য গান
আসরে।" মুক্ত ছন্দের গানের গায়কি সম্বন্ধে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম
অবশ্যই প্রামাণিক হিসেবে গণ্য। মুক্ত ছন্দ নিয়ে যারা তালবদ্ধ পরী
এবং সংযোজন করছেন তাঁদের পক্ষে কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য।

কবিতায় ছন্দ এবং গানের তাল যে অভিন্ন এটা রবীন্দ্রনাথের নি
ধারণা—যার সঙ্গে সঙ্গীতের ছান্দসিকগণ একমত হতে পারেন নি। অত
লেখকদ্বয়ের এবংবিধ প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গীতানুরাগী মহলের কারো কা
মতদ্বৈধ ঘটা অসম্ভব নয়। বস্তুত ভারতীয় সঙ্গীতে ছন্দ এবং তাল
অর্থে প্রযুক্ত হয়ে এসেছে। সাঙ্গীতিক ছন্দের অর্থ চলন। চৌতালের
দ্বিমাত্রিক বলেই একে দুই মাত্রার তাল বলা যেমন ভুল, বারো মাত্রার বল
তেমনি ; কারণ বারো মাত্রার আরো বহু তাল আছে যাদের সঙ্গে চৌতা
পার্থক্য শুধু ছন্দ অর্থাৎ চলনেই নয়, তালেও। সাধারণত ঘাতপ্রধান প
দ্বারাই তালের সংখ্যা এবং সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়ে থাকে। সেই কা
চৌতালে যদিও দুই মাত্রার ছয়টি পর্বে বারোটি মাত্রা নিষ্পন্ন হয় ত
চারটি আহত পর্বের দ্বারাই তার নাম চৌতাল। অতএব ছন্দ এবং
সমার্থক নয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের কতিপয় প্রশ্ন এই পুস্তকে যেভাবে আলোচিত হয়েছে
তা থেকে জিজ্ঞাসু পাঠক আলোক লাভ করবেন।

গায়কগায়িকার পক্ষে শব্দবিজ্ঞান অথবা ব্যাকরণ জানা আবশ্যক হয় না
তাঁদের পক্ষে সঙ্গীতের ব্যাকরণ জানাই যথেষ্ট। কিন্তু এঁদের মধ্যে

শব্দশাস্ত্রের আলোচনায় ব্রতী হন, শব্দবিজ্ঞান অর্থাৎ ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা তাঁদের পক্ষেও আবশ্যক হয়ে পড়ে। স্বরযোজনার যেমন কতকগুলি নিয়ম-কানুন আছে, শব্দযোজনারও তেমনি। রবীন্দ্র এবং সঙ্গীত দুটো শব্দই তৎসম হওয়া সত্ত্বেও এদের যখন একপদ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন মাঝখানে একজন হাইফেনের মধ্যস্থতা কেন যে অপরিহার্য বিবেচিত হয় তা দুর্বোধ্য ঠেকে। "আন্তর-দ্যুতি"র মাঝখানেও অনুরূপ ঘটনা। স্বতঃ+স্ফূর্ত=স্বতস্ফূর্ত, স্বতঃ+উৎসারিত=স্বতোৎসারিত বিপরীত দৃষ্টান্ত। চাকচক্যের জায়গায় "চাকচিক্য"কে না হয় বরদাস্ত করা যায় কিন্তু "রাগাতীগ"-কে সহ্য করা সহজ নয়। মুলতানকে আমরা যেরূপে মানি 'মূলতান' তা থেকে স্বভাবতই স্বতন্ত্র। বৃন্দবাদ্য অর্থে রেডিওর কর্তারা যদি 'বাদ্যবৃন্দ' লেখেন তা হলেই তাকে মেনে নেওয়ার কি যুক্তি আছে? না-গান-গাওয়ার বদলে "নাচ-গান-গাওয়ার" (পৃঃ ৪৮) স্পষ্টতই মুদ্রণপ্রমাদ।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস শান্তিনিকেতন সঙ্গীত ভবনের প্রাক্তন ছাত্র, অধুনা রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক এবং স্বরলিপিগবেষক। তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ : প্রথম খণ্ড' প্রথম শিক্ষার্থীদের থেকে আরম্ভ করে উচ্চতর মানের শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত। প্রারম্ভিক মান থেকে সুরু করে পর্যায়ক্রমে একটি সুপরিকল্পিত এবং বৈজ্ঞানিক পাঠক্রমের ছক এই পুস্তকে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত, শিক্ষণীয় রাগ, কণ্ঠসাধনপ্রণালী, সার্গম, ঔপপত্তিক আলোচনা, তাল ইত্যাদির দ্বারা রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে নিরর্থক ভাবুকতার পরিবর্তে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে শ্রীদাস আলোচনা করেছেন সঙ্গীতবিজ্ঞানের প্রক্রিয়ায়। সমগ্র পাঠক্রমটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং অন্ত্য এই তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি পর্যায়ের শেষে প্রাসঙ্গিক ঔপপত্তিক আলোচনা যোগ করায় পাঠক্রমটি সমৃদ্ধ হয়েছে অথচ কোথাও অনাবশ্যক ইতিহাসের কচকচি জুড়ে দেওয়া হয় নি। তালবদ্ধ সার্গম থাকাতে রাগের ঠাট অধিগত করা খুব সহজ হবে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে রাগসঙ্গীতের পুরো মিল নেই এবং একের ব্যাকরণের দ্বারা অন্যটি চালিত হয় না। কিন্তু রাগ পরিচয়, তাল পরিচয় এবং কণ্ঠ-মার্জনার জন্য রাগসঙ্গীতের সঙ্গে যোগাযোগ আমরা ছিন্ন করতে পারি না। কারণ ওটাই হলো ভারতের মৌলিক সঙ্গীতবিজ্ঞান। শ্রীদাসের পুস্তকটির

সবচেয়ে আকর্ষণীয় অঙ্গ হলো কালোয়াতী হিন্দুস্থানী গান-ভাঙা রবীন্দ্রগীতি ও মূল গানের পাশাপাশি স্বরলিপি। ভূপালী রাগের মূল গান 'প্রচণ্ড গর্জন সজল বরখা ঋতু' এবং তা থেকে ভাঙা রবীন্দ্রগীতি 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন' (সুরফাঁক তাল), ষড়ভট্টের মূল গান 'ফুলি বন ঘন মোর আয় বসন্তরি' এবং তা থেকে ভাঙা গান 'আজি মম মন চাহে জীবন বন্ধুরে' (বাহার, চৌতাল) ইত্যাদি স্বরলিপির তুলনামূলক আলোচনাই প্রমাণ করবে যে রবীন্দ্রনাথের ভাঙা-গানে হিন্দুস্থানী প্রভাব কতখানি এবং কতখানি নয়। মূল গানের স্বরলিপিসহ আরো দুটি গানের স্বরলিপি এ বই-এ সন্নিবিষ্ট হয়েছে—'আনন্দ ধারা' এবং 'কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে'। সাঙ্গীতিক প্রত্যয় সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন উক্তি, লেখন এবং বচন পুস্তকটির পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় শিক্ষার্থীগণ তাঁর সাঙ্গীতিক চেতনার প্রাথমিক পরিচয় লাভ করতে পারবেন। তালের মাত্রাবিভাগসহ রবীন্দ্রসঙ্গীতে ব্যবহৃত বিবিধ তালের পরিচয় এবং ঠেকা দেওয়া হয়েছে। আমার ধারণা শুধু শিক্ষার্থীই নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের গবেষকদের কাছেও পুস্তকটি মূল্যবান পরিগণিত হবে। শ্রুতিতত্ত্বে শ্রীদাস ভাতখণ্ডের চেয়ে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের অনুসরণ করে ভালোই করেছেন মনে হয়। কারণ ভাতখণ্ডের শ্রুতিতত্ত্ব এখন আর অবিসংবাদিত নয়। আকারমাত্রিক স্বরলিপির ব্যাখ্যাটি অনেকেরই কাজে লাগবে। বস্তুত এত অল্প বাক্যব্যয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত কি এবং কি নয়—তার এমন সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক পরিচয় এই পুস্তকটি ছাড়া এই বিষয়ক আর কোনো পুস্তকে পাই নি। বক্ষ্যমান পুস্তকটি এই পর্যায়ের প্রথম খণ্ড। আমরা আশা করব এর দ্বিতীয় খণ্ডটি আরো তথ্য এবং তুলনামূলক স্বরলিপির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য, অপরাপর সঙ্গীতের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ও পার্থক্য এবং এতে রাগসঙ্গীতের নানাবিধ অলঙ্কার যোগ না করার যুক্তি প্রফুল্লবাবু বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাম্প্রতিক অরাজকতা সম্বন্ধেও তিনি নীরব থাকেন নি। গন্ধ ঢঙের গানের গায়কি সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেছেন। প্রফুল্লবাবু রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং সঙ্গীতবিজ্ঞানের মধ্যে প্রথম সংযোগ সাধন করেছেন অথচ কোথাও রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।

বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিবর্তন

দেবেশ রায়

আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনের অষ্টাবক্র বিকাশের ওপর নির্ভরশীল বিচিত্র জটিল উপন্যাস সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করবার সময়, নিয়মমাফিক অর্থনৈতিক বিকাশের চিরকালের উদাহরণস্থল ইংলণ্ডের উপন্যাস সাহিত্যের সমালোচনার আদর্শ সামনে রেখে, গবেষকের অনেকখানি মূল্যবান শ্রম ও শক্তি অপচয় হতে দেখেছি নবাবী আমলের বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের বীজ-সন্ধানে। যার ফলে, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামক সুপরিচিত বিরাট গ্রন্থে অনেক লেখককে অবধারিত বিস্মৃতির হাত থেকে যেমন বাঁচিয়েছেন, তেমনি জগদীশ গুপ্তের মতো বিরাট ব্যক্তিকে একেবারে বিস্মৃত হতেও পেরেছেন। এই স্মৃতি-বিস্মৃতির খেলার পেছনে অর্থনীতির সুতো আবিষ্কারের চেষ্টায় শ্রীঅচ্যুত গোস্বামী মহাশয় 'বাংলা উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে লেখকদের গ্রন্থের বিশ্লেষণে প্রবেশ করলেন না, সাহিত্যের মানদণ্ডে দাঁড় করালেন না বাংলা উপন্যাসকে, শুধু প্রবণতাগুলির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিলেন। শ্রীঅচ্যুত গোস্বামী মার্কসবাদী সমালোচকদের মুখরক্ষা করেছেন, সামগ্রিকভাবে উপন্যাস-সাহিত্য সম্পর্কে মার্কসবাদী সমালোচনাসূত্র তিনিই সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেছেন। এবং হয়তো সে কারণেই নিজেকে তিনি সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি* এ বিষয়ে তৃতীয়। না বলে দিলেও তা বোঝা যায় গ্রন্থের উপ-নামের দিকে তাকালেই। (এখানে একটি সন্দেহ প্রকাশ করে নেওয়া ভালো। গ্রন্থের উপনাম হিসেবে যে বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে—"গত একশো বছরের বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনের সুচিন্তিত সমালোচনা"—তাতে "সুচিন্তিত" এই বিশেষণটিতে যেন প্রকাশকের কলমের আঁচড় দেখা যায়। শব্দটি আমাদের ভালো লাগে নি।) এবং বাঙলা উপন্যাস সমালোচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে লেখক যে অতিমাত্রায় সচেতন তা বোঝা যায় তাঁর

*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন সাহিত্য ভবন। নয় টাকা।

গ্রন্থের কয়েকটি পাতা পড়লেই। এবং সে কারণেই এ সমালোচনায় প্রথমেই আমরা পূর্ববর্তী গ্রন্থ দুটিকে স্মরণ করেছি। সেই সমালোচনা ধারাতেই এই তৃতীয় গ্রন্থটিও রচিত। নিঃসন্দেহে সেই ধারাকে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা পদ্ধতি এই প্রকার—(১) লেখককে উপস্থিত করবার সময়ই ক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলো পরিচয় দেওয়া, ও, সেই সকল শক্তির সমন্বয় বা অসমন্বয়ের সম্ভাব্য ফলে ইঙ্গিত দেওয়া ; (২) লেখকের প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রন্থ নির্বাচন ও কারণ প্রদর্শন (৩) সেই গ্রন্থগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ।—লেখকও তিনি নির্বাচন করে নেন, এবং, সেটাও করেন সামাজিক কার্য-কারণ-সূত্রে। এইভাবে তিনি পুঁথিগত সমালোচনাপদ্ধতি ও মার্কসবাদী সমালোচনাপদ্ধতির মধ্যে একটি বাস্তব সমন্বয় সাধন করেছেন। এটি তাঁর প্রথম কৃতিত্ব।

শরৎচন্দ্রের প্রবাদবাক্যকে অনেকদিন থেকে ঘা দেওয়া হচ্ছে। এবং তার জায়গায় বুদ্ধদেব বসু-প্রেমেন্দ্র মিত্র-অচিন্ত্যকুমার ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন প্রবাদবাক্য রচিত হয়েছে। স্বয়ং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কাব্যধর্মী উপন্যাস' নাম দিয়ে বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের সাহিত্যকীর্তি এবং 'বুদ্ধিপ্রধান জীবনসমালোচনা' নাম দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও প্রবোধ সান্যালের সাহিত্যকীর্তি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কিত অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন—'জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যার আরোপ'। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস এতদিন পর্যন্ত এই অনৈতিহাসিক সূচীপত্রকেই স্বীকার করে নিয়েছে। তার ফলেই এতকাল বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় ১৯১৬—১৯৩০ (শরৎচন্দ্রের কলকাতা আগমন, 'কল্লোল'-'কালিকলম' ইত্যাদির প্রকাশ, বুদ্ধদেব বসু-প্রেমেন্দ্র মিত্র-অচিন্ত্যকুমারের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ঘটনাকাল) পর্যন্ত সময়টিই সবচেয়ে বেশি স্থান নিয়েছে। সরোজবাবু বাংলা উপন্যাসের যে প্রকৃত ইতিহাস এতকাল আড়ালে ছিল—তাকে উদ্ধার করেছেন, প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। এটি তাঁর গ্রন্থের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব। তাঁর প্রথম তিনটি প্রবন্ধ ('উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য', 'উপন্যাসে বিষয়বস্তুর তাৎপর্য', 'উপন্যাসের ভাষারীতি') একটি গুচ্ছ। বাকি সাতটি একসঙ্গে দেখলেই আমাদের পূর্ববর্তী মন্তব্যের সমর্থন মিলবে। 'বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন—আলালের ঘরের দুলাল', 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা', 'রবীন্দ্রনাথ ও

বাংলা উপন্যাসের নব-নিরীক্ষা', 'শরৎচন্দ্র ও ঔপন্যাসিকের দ্বিধা', 'জগদীশ গুপ্ত ও শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া', 'তিরিশের যুগ : বাংলা উপন্যাসের দ্বিধামুক্তি', 'উদভ্রান্ত বর্তমান এবং বাংলা উপন্যাস'।

এই সূচীপত্র দেখলেই বোঝা যায় লেখক বাংলা উপন্যাসের ধারা (Process)-টিকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। সেই ধারার সমগ্র চিত্র তিনি যখন আমাদের সামনে সূচীপত্রেই মেলে দিলেন তখনই তো তিনি প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলির ভূমিকা সৃষ্টি করলেন—যে ভূমিকা 'বুদ্ধিপ্রধান জীবন সমালোচনা', 'কাব্যধর্মী উপন্যাস' ইত্যাদি বিশেষণাত্মক নামকরণে নেই।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় কৃতিত্ব : বাংলা উপন্যাসকে একটি বিশ্বমানে বিচারের চেষ্টা। উপন্যাসে বাস্তববর্ণনার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে নিঃসংশয়ে তিনি যখন 'রবিনসন ক্রুসো', 'ওঅর এ্যাণ্ড পীস' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করেন ; বা, অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য'র ঘটনাস্থল ইওরোপ কেন, এই প্রশ্নের মীমাংসায় যখন তিনি অবলীলাক্রমে টমাস মান-এর 'ম্যাজিক মাউণ্টেন'-এর ঘটনাস্থলের রূপক ব্যাখ্যা করেন ; বা, 'রাজসিংহ' প্রসঙ্গে অনায়াসে টলস্টয় ও বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-দৃষ্টি আলোচনা করেন ; বা, ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক জীবনব্যাখ্যা উপন্যাসের প্রতি অংশে কী ভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে তার উদাহরণ হিসেবে 'ওঅর এ্যাণ্ড পীস' এবং 'ম্যাজিক মাউণ্টেন'-এর মতো সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের ঘটনা ব্যাখ্যা করেন—তখন দীন আত্মতৃপ্তি বা দরিদ্র হীনম্মন্যতাবোধের পরিবর্তে, স্ব-সাহিত্যের সম্পদে সুস্থ গৌরববোধ আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

সমগ্র গ্রন্থটি সম্বন্ধে এগুলো সাধারণ মন্তব্য। প্রতিটি অধ্যায়ের আলাদা আলোচনা দ্বারাই একমাত্র দেখা যেতে পারে সরোজবাবুর সিদ্ধান্তগুলি কত দৃঢ় যুক্তি ও তথ্যের ওপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম প্রবন্ধ 'উপন্যাসের শিল্পরূপের বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধে লেখকের সিদ্ধান্তগুলি নিম্ন প্রকার :

১ নাট্যকারকে শুধু নাটক জানলেই হয়, কবিকে শুধু কবিতা। কিন্তু উপন্যাসকার জানেন যে জীবন শুধু নাটক নয়, শুধু কবিতাও নয়।… উপন্যাস সর্বগ্রাসী। (পৃঃ ১১)

২ জীবন প্রত্যক্ষ সৃষ্টিবাচকতায় পূর্ণ হলে উপন্যাসেও আসে মানুষের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও প্রত্যক্ষ সঙ্কটের ছায়া এবং তদুপযুক্ত মাধ্যম বা আঙ্গিকরীতি।

জীবন অবক্ষয়ে ক্লান্ত, কর্মসার্থকতাহীন পরোক্ষ এবং নেতির সম্মুখীন হলে তার প্রসঙ্গ প্রকরণও বিভিন্ন। ডিফো-ফিল্ডিং থেকে লরেন্স-জয়েস সেই ইতিহাস। (পৃঃ ২৩)

৩ …Life and Pattern-এর যুগল দাবিতে গড়ে ওঠে সার্থক উপন্যাস।… জীবনের সামগ্রিক বোধ এবং Pattern-এর ব্যাপারটি পরস্পর ঘনসন্নিবদ্ধ। এ কারণেই উপন্যাস কখনোই realism naturalism ইত্যাদির পুঁথিনির্দিষ্ট ছককে অনুসরণ করে চলে না।

মনে হয় সাহিত্যের অন্যান্য শিল্পরূপ থেকে উপন্যাসকে পৃথক করার প্রবণতায় লেখক প্রচলিত ধারণার পুনরুক্তি করে প্রথম সিদ্ধান্তে এসেছেন। একটু যাচাই করলেই দেখতে পেতেন, নাটক-কবিতা বা উপন্যাসের মধ্যে ভেদরেখা আর ঐ কথাকটিতে সীমাবদ্ধ নেই। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে বা গত শতাব্দীর শেষ দিকে ও-নিল বা শেখভ-এর নাটকের অনেক জায়গায় আজকের পাঠক বুঝতে পারেন না, নাটকের 'নাটকীয়তা'য় যা বলা যায় না, যাচ্ছে না, নাট্যকার কী সে কথাও বলে দিতে চান। আর হাল আমলের নাটকে তো উপন্যাস ও নাটকের প্রাচীন সীমারেখাকে প্রায় তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সেখানে, আমাদের আশা ছিল, সরোজবাবু অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন প্রচলিত ধারণাকে যাচাই করে নিয়েছেন, এ ক্ষেত্রেও তেমনি করবেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিদ্ধান্ত দুইটিই ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয় যে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র পণ্ডিতি বা পুঁথিগত আলোচনাকে কত সচেতন ও স্বাভাবিকভাবে এড়িয়ে সাধারণ একটি সত্যে পৌছতে পারেন। কিন্তু সবসময় সেটি বোধহয় ভালোও নয়। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যদিও আমরা স্বস্তি বোধ করি যে লরেন্স-জয়েস শ্রেণীর বহুবিতর্কিত লেখকদের তিনি তাঁদের সামাজিক ভূমিকায় স্থাপন করেছেন, কিন্তু তৃতীয় সিদ্ধান্তের বেলায় ক্ষোভ থেকে যায়, বাস্তবতা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা থেকেই যে ism-গুলোর জন্ম, সেগুলো নিয়ে তিনি আলোচনা করেন না বলে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'উপন্যাসের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য'-এ লেখক বিভিন্ন উদাহরণ সহযোগে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন, চরিত্র, কাহিনী সব মিলিয়ে ঔপন্যাসিকের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাকে কীভাবে প্রকাশিত করে। প্রসঙ্গত রাসকলনিকভ, নিকল্যুদফ, মাদাম বোভারি, আনা কারেনিনা, ভ্রমর, কুমু ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে তিনি অনেক পরিমাণ ব্যাখ্যা করেছেন। আর ব্যাখ্যা

করে বলতে চেয়েছেন, যাকে পটভূমি বা পরিপ্রেক্ষিত বলা হয়, উপন্যাসে সেটি কত প্রয়োজনীয় কথা। "এই ব্যক্তি আর পরিবেশকে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ঔপন্যাসিক দেখান কী এবং কতটুকু মিলছে এবং কী এবং কতটুকু মিলছে না।" এর সঙ্গে যদি তৃতীয় প্রবন্ধ 'উপন্যাসের ভাষারীতি' মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে বোঝা যায়, লেখক, এই প্রথম তিনটি প্রবন্ধ জুড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা দিক দিয়ে একটি সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, পটভূমি বা পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে লেখকের ধারণা থেকেই আর সব বিষয়ের জন্ম, এবং যে কোনো উপন্যাস বিচারকালেই সেই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত ও ক্ষুদ্রতম বস্তুবর্ণনাকে লেখকের জীবনধারণার টীকারূপে দেখতে হবে। তাই এর পরে তিনি যখন বঙ্কিম-ব্যবহৃত একটি উপমাব্যাখ্যা ("চাষার মেয়ের মতো"), বা, 'গোরা'য় ব্যবহৃত উপমাগুলির শ্রেণীবিন্যাস করেন, তখনো সেটি করেন উপন্যাসের সমগ্র শিল্পরূপের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই।

বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্নের বিশ্লেষণে লেখক বাংলার নবজাগরণের মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন "স্বভাবতই ব্রিটিশ পুঁজির এই নিরাপদ প্রয়োগক্ষেত্রে তেমন ভালো করে কিছু গড়ে উঠলো না, ভালো করে কিছু ভেঙেও গেল না। সেই অষ্টাবক্র অসম্পূর্ণতার মাঝখানে বাস্তবজীবনাগ্রহও সম্যক এবং সম্পূর্ণ হতে পারে না। সে অসম্পূর্ণতার দায়ভাগ আমাদের উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকেই বহন করতে হচ্ছে।"

অনেকদিন ধরেই তো এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে আসছে। তাই আশা করেছিলাম সরোজবাবু অন্তত এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো উত্থাপন করবেন— (১) অর্থ নৈতিক প্রগতির "অষ্টাবক্র অসম্পূর্ণতা"ই যদি "বাস্তব জীবনাগ্রহ" সৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে বাধা হয়ে থাকে, তবে নিয়মমাফিক অর্থনৈতিক প্রগতির উদাহরণস্থল ইংলণ্ডে অন্তত উপন্যাসে "বাস্তবজীবনাগ্রহে"র সেই ব্যাপক-গভীর প্রকাশ ঘটল না কেন, যেমন ঘটেছিল অষ্টাবক্র অসম্পূর্ণতার উদাহরণস্থল উনিশ শতকের রাশিয়ায়? (২) "কলকাতাকে আশ্রয় করে বাংলায় মধ্যবিত্ত মানসেও এই জীবনাগ্রহ অঙ্কুরিত ও সঞ্জীবিত হল বটে, কিন্তু এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসম্পূর্ণতায় এই জীবনাগ্রহেরও অসম্পূর্ণতা অনুভূত হল।" পৃথিবীর সর্বত্রই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনাগ্রহ অসম্পূর্ণ। কিন্তু যেটুকু সাময়িক সম্পূর্ণতা তারা ঐতিহাসিক কারণে পেয়ে থাকে, সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা তারা এদেশেও পেয়েছিল। অথচ সেই সম্পূর্ণতার প্রকাশ উপন্যাসে

তদনুপাতে ঘটল না কেন? (৩) ইংলণ্ডের নেতৃত্বে কালান্তর এলেও নবজাগরণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে কি ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা উচিত, এবং সেদিক দিয়ে কি তার সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতা বিচার করা উচিত?

সরোজবাবু পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিষয়কে কোনো সময় আলোচনা করেন না বলেই, বাংলার নবজাগরণ-আন্দোলনের ভিত্তিতে 'ফুলমনি ও করুণা' আর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা করে প্রথম বাংলা উপন্যাসের দাবির মামলা নিষ্পত্তি করেন। সামাজিক উপযোগিতাবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনা একদিকে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনাবৃত্তিকে, অপরদিকে "দেশজ শিল্পের বিপর্যয়ের প্রতি তাঁর অনাগ্রহকে কী করে প্রশ্রয় দেয়; আর এই প্রায়-পরস্পরবিরোধী দেশদৃষ্টির ফলে বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্র আর ঘটনাগুলি সুগভীর মননশীলতা দ্বারা সুমার্জিত এবং যুক্তিশৃঙ্খলায় বাঁধা হওয়া সত্ত্বেও অনিবার্যভাবে চরিত্রগত সীমাবদ্ধতায় খণ্ডিত হয় কেমন করে—'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'কপালকুণ্ডলা'র গঠনকৌশল, ভাষা, চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক—ইত্যাদি ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তা সরোজবাবু প্রমাণ করেছেন। সেই ব্যাখ্যার সূত্রে রোহিণীহত্যার মতো পুরাতন প্রশ্নের নতুন মীমাংসা দেবার চেষ্টা যেমন তিনি করেছেন, তেমনি, 'রাজসিংহ' প্রসঙ্গে বঙ্কিমের ইতিহাস-চেতনার একটি নতুন অংশে আলোকপাত করেছেন। আমাদের মনে হয় 'সীতারাম' উপন্যাসটিকেও তাঁর আলোচনার অন্তর্গত করলে দ্বন্দ্বে দীর্ণ উনিশ শতকের বাঙালী মধ্যবিত্তের মহৎ কল্পনা কী করে অবধারিত ট্রাজেডিতে পরিণত হলো ও জীবনের নৈতিক তাৎপর্য কী করে হিন্দুনীতিক তাৎপর্যে পর্যবসিত হলো—সে বিষয়ে লেখক নতুন আলোকপাত করতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথের ওপর রচিত অধ্যায়টিতে তিনি সর্বপ্রধান দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন—ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে সত্যমূল্যে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই একদিকে "কবির কলমে উপন্যাস" ইত্যাদি নির্বোধের উক্তি, অপরদিকে বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি স্বনামখ্যাত সমালোচকগণের "রবীন্দ্রনাথ কবি আর কথাশিল্পীর সম্পূর্ণ সঙ্গতি ঘটাতে পারেন নি" ইত্যাদি সিদ্ধান্ত—এই উভয় পথকে পরিহার করে লেখককে সম্পূর্ণ নতুন পথ আবিষ্কার করতে হয়েছে। এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্বন্ধে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই বলেন, (১) "তিনি অখণ্ড মানুষকে উপন্যাসে ধারণ করার পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি জানতেন যে ব্যক্তি-মানুষের জীবন আস্ত একখানা জীবন। একটা ঘটনা শুরু হবার পর থেকে সে জীবন ঔপন্যাসিকের কাছে আগ্রহোদ্দীপক হয় না। জীবন আস্ত সমগ্রতা নিয়ে ঔপন্যাসিককে আকর্ষণ করে। তাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে জীবনের যে প্রচণ্ড টান অনুভূত হয় তা কদাচ বাইরের ঘটনার সাহায্যে উদ্দীপিত ব্যাপার নয়।" (২) "রবীন্দ্রনাথই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সেই লেখক…যিনি স্পষ্ট অর্থে নাগরিক মনের অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন।" 'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ'—এই চারটি উপন্যাস আলোচনা করে সরোজবাবু তাঁর উক্ত দুই সিদ্ধান্তের সমর্থন করেছেন। 'চোখের বালি'র সঙ্গে 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর তফাৎ দেখাতে গিয়ে সরোজবাবু বলেছেন—'চোখের বালি'র সমস্যা পুরুষের রূপমোহ বা বিধবার প্রেম নয়; বিনোদিনী, মহেন্দ্র-আশা-বিহারী প্রমুখ সামাজিক রীতিনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বতন্ত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। এই সূত্রেই 'গোরা' উপন্যাসের বিস্তৃত ও গভীর আলোচনার ভূমিকাতেই লেখক সূত্র নির্দেশ করেছেন—"কেমন করে গোরা সকলকে উপলব্ধি করল, এবং সকলে গোরাকে উপলব্ধি করল এটাই এ উপন্যাসের সমস্যা।" এই সমস্যার রূপায়ণ বিচার করতে গিয়ে সরোজবাবু 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে 'গোরা' রচনার বীজ আবিষ্কার করে, বিশ্লেষণ শুরু করেছেন। সানন্দে স্বীকার করছি, সরোজবাবুর গ্রন্থ পড়বার পূর্বে 'মেঘ ও রৌদ্র'কে রবীন্দ্রনাথের একটি শিথিল ও অসার্থক গল্প বলেই মনে করতাম। রবীন্দ্রনাথের চেতনায় 'গোরা' কী ভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, গোরা চরিত্রের সমস্যা ভারতবর্ষের আত্মসন্ধানের যন্ত্রণায় কী ভাবে পরিণত হয়েছে, অস্তিত্বের খণ্ডীভবনের অসঙ্গতি মহিম এবং পাণুবাবুর সঙ্গে গোরাকেও কী ভাবে আক্রমণ করেছে, ও, সেই অসঙ্গতি থেকে উত্তরণের সংগ্রামে কী করে গোরা তদবধিকাল অনাবিষ্কৃত "বাস্তব ইতিবাচকতা"কে উপস্থিত করেছে সব কিছুই সরোজবাবু ব্যাখ্যা করেছেন। 'গোরা' সম্বন্ধে এই বিশদ আলোচনার জন্য 'চতুরঙ্গ' ও 'যোগাযোগ' সম্বন্ধে আলোচনাকে আকারের দিক থেকে খানিকটা ছোট করতে হয়েছে। আর, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্বন্ধে কতকগুলি ভুল ধারণা অপনোদনেও অনেক পরিমাণ জায়গা দিতে হয়েছে। আমরা আশা করব রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সম্বন্ধে সরোজবাবু আরো ব্যাপক ও বিশদ আলোচনা ভবিষ্যতে করবেন। এই গ্রন্থেই সে আলোচনার ইঙ্গিত তিনি রেখেছেন।

এর পরের চারটি প্রবন্ধের নাম 'শরৎচন্দ্র ও ঔপন্যাসিকের দ্বিধা', 'জগদী গুপ্ত ও শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া', 'তিরিশের যুগ: বাংলা উপন্যাসে দ্বিধামুক্তি', 'উদভ্রান্ত বর্তমান এবং বাংলা উপন্যাস'। প্রথমটি নিয়ে কি কিঞ্চিৎ আলোচনা যদিও হয়েছে, আর সবগুলি একেবারে নতুন। প্রথম দু প্রবন্ধের আলোচনাতেই আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি সরোজবাবুর সমালোচ ক্ষমতা প্রায়-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকেও নতুন তথ্য ও ব্যাখ্যা দ্বারা কী ভা পরিবর্তিত করতে পারে। সেক্ষেত্রে নতুন বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি যে গভী মৌলিকতার পরিচয় দেবেন, সে বিষয়ে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে মতবিরোধের অবকাশ একাধিক ক্ষেত্রে আছে। কিন্তু সেটাই প্রমাণ কা তিনি সংক্ষিপ্তসার দেন নি, নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, নতুন সূত্র দিয়েছেন— সে সূত্রকে পরীক্ষা করতে হলে সমপরিমাণ তথ্য ও নিষ্ঠা নিয়ে অগ্রস হতে হবে।

বস্তুত বাংলা উপন্যাসের প্রকৃত ইতিহাসের প্রথম রচয়িতা হিসাবে সরো বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে স্বীকৃত হবেন।

মৌমাছিতন্ত্র ও মানবতন্ত্র

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

কিছুদিন ধরে বাংলাদেশে মৌলিকতাপ্রিয় বুদ্ধিজীবীদের ইতস্তত নানা বিচিত্র মন্তব্য চোখে পড়ছে। শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ এইসব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য ভাষার লেখক, এবং সে-কারণে সমধিক জনপ্রিয়। আত্মনিগ্রহ থেকেই যে রবীন্দ্রচিত্রকলার জন্ম—এসব কথা আমরা প্রথম তাঁর মাধ্যমেই অবগত হয়েছি। বাংলা সাহিত্যে বাথরুম নেই, এই তীক্ষ্ণদর্শী আবিষ্কারের মর্যাদাও তাঁর প্রাপ্য।

শিবনারায়ণ রায়ের 'মৌমাছিতন্ত্র'* তাঁর অন্য গ্রন্থের মতোই চটকদার দৃষ্টান্ত সমারোহে, যুক্তির নামে সরলীকৃত সিদ্ধান্তে আকর্ষণীয়।

শিবনারায়ণবাবু মানবেন্দ্র রায়ের মতের প্রবক্তা। মানবেন্দ্র রায়ের রচনাবলী মুখ্যত ইংরাজীভাষায় আবদ্ধ, শিবনারায়ণবাবুর দু-চারটি ইংরাজী বই থাকলেও তিনি বাংলা লেখার মাধ্যমেই বাঙালী পাঠকসমাজে পরিচিত। মানবেন্দ্র রায়-পন্থীরা সোভিয়েতব্যবস্থার প্রতিপক্ষ, সেই bias-এর মধ্যেই তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা, নিদাঘ-আলোচনা-শিবির নিয়ন্ত্রিত। কোয়াণ্টাম থেকে আধুনিকতম বিজ্ঞানতত্ত্বে পর্যন্ত তাঁরা আগ্রহী। তাই প্রাচীন ভাববাদী দার্শনিক বা ধর্মধ্বজী সংস্কারকের তুলনায় তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিশীল। কিন্তু যেখানে বুদ্ধিজীবীকে রাষ্ট্রের কাছে দায়িত্ব পালন করতে হয় সাধারণ নাগরিকের মতোই, সেই সোভিয়েত সমাজ সম্বন্ধে তাঁরা বরাবরই বিদ্বিষ্ট। শিবনারায়ণবাবুর আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'মৌমাছিতন্ত্র'-এ এই বিদ্বেষ প্রকাশিত।

'মৌমাছিতন্ত্র' কথাটি রবীন্দ্রনাথ থেকে গৃহীত। 'কানু ছাড়া গীত নাই'-এর মতো অধুনা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রস্তাবনা নেই। 'অধিক ফলাও' থেকে আরম্ভ করে 'বাঙালী জাগো' আন্দোলন পর্যন্ত রবীন্দ্রবচনের যথেচ্ছ প্রয়োগ ও ভাষ্য। শ্রীযুক্ত রায়ও এই সহজ কৌশলের সদ্ব্যবহার করেছেন।

---

*মৌমাছিতন্ত্র। শিবনারায়ণ রায়। রেনেসাঁস পাবলিশার্স। সাড়ে তিন টাকা

কবি নিজের রাষ্ট্রনীতি-চিন্তা সম্পর্কে বলেছেন, "যে মানুষ সুদীর্ঘক থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকতা দেখাই সঙ্গত।…রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুস ভাবে কোনো-এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি, জীবনে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে।" শচীন সেনের গ্রন্থ পড়ে যে ভ্রান্তির বিরুদ্ধে কবি সতর্কবাণী লিপি করেছিলেন, শ্রীযুক্ত রায় তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি; কিংবা নিজে সুবিধার্থে অগ্রাহ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা-প্রজা', 'সমূহ', 'স্বদেশীসমা বা 'কালান্তর' প্রবন্ধাবলী কালানুক্রমিক অনুসরণ করলে তাঁর বিশিষ্ট চি ধারা, emphasis-এর ধরন, গতিশীল মনোভাব যতটা চোখে পড়ে, ত স্পষ্ট হয় না কোনো প্রচলিত পথে একটা সমাজচিন্তা-পদ্ধতির (System social thought) ধারাবাহিক বিন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষের চিত্তশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলে দেশের জলকষ্ট, অশিক্ষা, হিন্দুমুসলমান সমস্যা, রাষ্ট্রীয় স্বরাজ সব বিষয়েই একধরনের সমাধান। আগে চাই অন্তরের শক্তি, অধিকারের যোগ্য পরে অধিকার। "যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তি স অন্তর প্রকৃতিতে, এইজন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ।…বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টি আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে দেশের মা আপনার আত্মাকেই ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্ব কর্মের দ্বারা সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি ত আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই।" এইরূপ ভারত প্রথম ঘটেছিল—রবীন্দ্রনাথের ধারণা—মহাত্মা গান্ধীর। 'সত্যের আহ্বা শিরোনামের অর্থ গান্ধীর নেতৃত্বেই প্রথম দেশবাসী কংগ্রেস সংগঠনে সত্যে আহ্বান শুনল। 'চরকা' বা 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে গান্ধীজির ভা বাহুল্যকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন জানাতে পারেন নি। শ্রীযুক্ত রায় যে প্র রুশোতে ফ্যাসীবাদ এবং হিটলার-মুসোলিনী-গান্ধীতে তার উত্তরসা নিঃসংশয়ে লক্ষ্য করতে পারেন, সে প্রবন্ধে 'সত্যের আহ্বান' থেকে উদ্ধৃ দেওয়া অসমীচীন।

An analogy is no argument—এই প্রাথমিক বোধ কবির ছিল ব

'মৌমাছিতন্ত্র' শব্দটি তিনি কখনো প্রয়োগ করেন নি। বলেছেন, "জন্তরা এ-জগতে পরাসক্ত," মানুষ কিন্তু "নিরন্তর একই প্যাটার্ণে জাল বোনে না।" এবং লক্ষণীয়, একই বাক্যে মৌমাছি ও মাকড়সার জড় জীবনযাত্রার প্রসঙ্গে মনে হয়, মানুষের সঙ্গে ঐ পরাসক্ত প্রাণীদের মৌলিক পার্থক্যটিই শুধু রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন। তারপর নিজস্ব রীতিতে তিনি চিত্তের জড়ত্ব মোচনের উপায় নির্দেশ করে শুভবুদ্ধি প্রার্থনা করেছেন, "য একোঽবর্ণঃ বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"। শ্রীযুক্ত রায় কি এই রাবীন্দ্রিক সর্বাস্তিবাদে বিশ্বাস করেন? মানুষের মধ্যেই মঙ্গলময়ের বিচিত্র প্রকাশ—একথা প্রাত্যহিক সত্যের মতো সর্বদা অনুভব করেন? নিশ্চয়ই করেন না, এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লজিক উদ্ধৃত করলে তার ভাবভূমিকেও গ্রহণ করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত বলেছেন, "স্পার্টা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে মানুষের শক্তিকে সঙ্কীর্ণ করে তাকে বল দেবার চেষ্টা করেছিল, স্পার্টার জয় হয় নি; এথেন্স মানুষের সকল শক্তিকে উন্মুক্ত করে তাকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছিল, এথেন্সের জয় হয়েছে"। শ্রীযুক্ত রায়ও এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। জর্জ টমসনের 'এস্কাইলাস এ্যাণ্ড এথেন্স' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। কিন্তু এর সঙ্গে লেখক উপনিষদ-বচন-সংহিতা উদ্ধার করে প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যাখ্যায় যে মৌমাছিতন্ত্রের সন্ধান পেয়েছেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐকমত্য হতো কি? "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা"—কবির কাছে আদর্শভ্রংশ নয়, মহৎ আদর্শেরই পরিচায়ক। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য কথিত অমৃতের সাধনাই কবির মতে মনুষ্যত্বের সাধনা। যতদূর জানি, মানবতন্ত্রী ঐতিহ্যের জীবনভাষ্য এর সঙ্গে মেলে না। প্রাচীন ভারতের সবটুকুই পরতন্ত্রতা এবং এথেন্সের দাস্য বিষয়ে নীরবতা ইতিহাসবিবেকের অভাবজাত ধারণা।

শ্রীযুক্ত রায় বর্তমান কালে মৌমাছিতন্ত্রের দুটি রূপ দেখেছেন। একটি ফ্যাসিজম্, অপরটি কম্যুনিজম্। আমাদের ধারণা ছিল, ফ্যাসিবাদ কম্যুনিজমের তথা মানবসভ্যতার শত্রু, এবং কম্যুনিস্টরাই দেশে দেশে ফ্যাসিবিরোধী সংগঠন গড়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের সভাপতিরূপেই একটি বিবৃতিতে বলেন, "The devastating tide of internationl Fascism must he checked. In Spain, this inhuman incrudescence of obscurantism, of racial prejudice

of rapine and glorification of war must be given the fin rebuff. Civilization must be saved from its being swamp by barbarians." (৩রা মার্চ, ১৯৩৭, 'স্টেটস্‌ম্যান', আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রশত সংখ্যায় উদ্ধৃত)। অন্যপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ কখনো সোভিয়েতের বিরু জনসাধারণকে সমবেত হতে বলেন নি। নোগুচির সঙ্গে বন্ধুত্ববিচ্ছেদ হয়েছি কিন্তু রঁল্যা বা পেট্রোভের সঙ্গে বিরোধ বাধে নি। শুধু 'রাশিয়ার চিঠি নয়, সোভিয়েত-প্রত্যাগত রবীন্দ্ররচনায় গভীর পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায় "পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞ" অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার সময় কবিে লোকে নানা কথা বলেছিল। অসংখ্য চিঠিতে যৌথখামারের চাষীদের স কবির কথাবার্তায় তার আভাস আছে। "আমার জানবার কথা এই এতে তোমাদের ইচ্ছার উপর জবরদস্তি করা হচ্ছে কিনা।" যৌথখামারে চাষীদের সম্পত্তির একত্রীকরণ সকলে যে খুশিমনে গ্রহণ করে নি, ঐ প তারও উল্লেখ পাই। কিন্তু তাদের অসম্মতির বা সম্মতির মূলে কোন জবরদস্তি ছিল না। "নিজের সম্পত্তির প্রতি নিজের মমতা, ওটা তর্কে বিষয় নয়, ওটা আমাদের সংস্কারগত।" রাশিয়াভ্রমণ তাঁকে "গভীরভা অনেক কথা ভাবিয়েছে।" তারই প্রথম প্রতিক্রিয়া জমিদারি ব্যবসা লজ্জাবোধ। শ্রীযুক্ত রায় ১৩ সংখ্যক পত্রের একাংশ উদ্ধার করে ফ্যাসিজ ও কম্যুনিজম্ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সমান অনীহা প্রমাণ করতে চেয়েছে (পৃঃ ১৯, 'মৌমাছিতন্ত্র')। ঐ পত্রেই কবি লিখেছেন, "যদিও সোভিয়ে মূলনীতি সম্বন্ধে এরা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অতি নির্দয়ভাবে পীড় করতে কুণ্ঠিত হয় নি, তথাপি সাধারণভাবে শিক্ষার দ্বারা চর্চার দ্বারা ব্যক্তি আত্মনিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেছে—ফ্যাসিস্টদের মতো নিয়তই তাকে পেষণ করে নি।…মানুষকে এরা দেহের দিকে নিপীড়িত করেছে, মনে দিকে নয়। যারা যথার্থই দৌরাত্ম্য করতে চায় তারা মানুষের মনকে মারে আগে—এরা মনের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুলেছে। এইখানেই পরিত্রাণে রাস্তা রয়ে গেল।" বোঝা যায়, কমিউনিজম্ গঠনের পথে বাধ্যতামূলক শ্রম, শিক্ষা, কৃষিকাজ প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে না পারলে ফ্যাসিজম্ ও কমিউনিজমের পার্থক্য তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় নি।

প্রবন্ধে বারংবার লেখক আক্ষেপ করেছেন, দেশের লোক বড় বেশি নির্বোধ, মূঢ়, তাই এখনো তাঁর মতো করে কেউ রবীন্দ্ররচনাংশ (মানবতন্ত্রী ঐতিহ্য) প্রয়োগ করতে শিখল না! অনেকেই শিখেছেন, যেমন আবু সয়ীদ আইয়ুব, অম্লানকুসুম দত্ত প্রভৃতি।

রুশো কল্পিত 'প্রাকৃত সমাজ', জাত্যাভিমানী ও সর্বগ্রাসী ফ্যাসিজম্ এবং শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর একনায়কত্ব তাঁর কাছে একার্থবোধক, সবই মৌমাছিতন্ত্র গড়বার প্রয়াস। হেগেলের চেয়ে কাণ্টেই কি রুশোর চিন্তা বেশি প্রতিফলিত হয় নি? অবশ্য হেগেলের রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তিস্বাধীনতা যে অস্বীকৃত হয়েছিল, একথা ঠিক। প্রসঙ্গত রুশোর general will-এর সঙ্গে সাম্যবাদের collective will-এর তুলনা অন্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "There can not be any contradiction between the Government and the individual. Following the footsteps of Rousseau whom the soviet theoreticians treat contemptuously and ungratefully as a petty bourgeois writer, soviet writers oppose the collective individual will to the individual will". ('সোভিয়েট রেজিম', ডব্লিউ. ডব্লিউ. কুলস্কি, পৃঃ ১৩১)। অবশ্য ইদানীংকালে ২০শ ও ২২শ পার্টি কংগ্রেসের বিবরণীতে যাকে 'personality cult' বলা হয়েছে, তাতে অবশ্য individual will এবং collective will-এর পার্থক্যই স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং ভিশিনিস্কির লেখা 'The law of the soviet state' থেকে collective will-এর অংশ উদ্ধৃত করে যদি কেউ বলেন, "Why are certain particular Individuals, for instance, the leaders of the Communist Party, entitled to proclaim that they express the dominant will of the Proletariat better than a group of workers could? And what entitles them to be identified with the collective individual?" সে-প্রশ্নকে নিতান্ত প্রতিবিপ্লবীর কূটপ্রশ্ন বলেই খারিজ করা যায় না। স্তালিনকে হত্যাকারী, চক্রান্তকারী, প্রতিহিংসাপরায়ণ বললেই দোষক্ষালন হয়না। কারণ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত 'collective will' তাঁর পক্ষেই ছিল; অর্থাৎ collective will-কে পার্টির নেতা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন। শক্তি কেন্দ্রীকরণের বিভ্রাট সোভিয়েতের মতো শক্তিশালী এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে উন্নত রাষ্ট্রে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, এমন সংশয় যাঁরা করেন তাঁদের মতকে এককথায় 'সোভিয়েত-বিরোধী' বলে নাকচ করাও সমীচীন নয়। 'মৌমাছিতন্ত্রে'-এ উল্লিখিত হিন্দু-

জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ফ্যাসিবাদী রূপ, সেবাব্রতী তা প্রজাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীকরণ প্রকৃতই আমাদের দেশে প্রতিক্রিয়া শক্তির নিদর্শন। গান্ধী যে যুক্তি-বুদ্ধি থেকে আমাদের মন পেছন দি ফিরিয়েছেন, একথাও একান্ত মিথ্যে নয়। তার অর্থনীতি পরিকল্পনা, শি পরিকল্পনা, গ্রামোদ্যোগ যে যুগোচিত নয়, তাঁর প্রমাণ গান্ধীবাদী রাষ্ট্রের শিল্পায়ন, দেশের সর্বত্র বিলাতী কায়দার স্কুল কলেজ স্থাপন। বঙ্কিমচন্দ্রের চি রক্ষণশীল উপাদান ছিল, কিন্তু সেটাই সব নয়; তাঁর চিন্তায় অগ্রসর পুরাতন ভাবধারার বিরোধটুকু লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে ফ্যাসিস্ট মনোভা সঙ্গে জড়িয়ে দেখা তো ঐতিহাসিক বিভ্রম মাত্র।

'মৌমাছিতন্ত্র' ছাড়া আরো তিনটি প্রবন্ধ আছে—'উদারতন্ত্রের অবক্ষ 'গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি', 'চার্চ, রেনেসাঁস ও মানবতন্ত্র'। মৌমাছিতন্ত্রের আলোচি ব্যক্তিত্ববিলোপের সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় প্রবন্ধে। উদারত ফ্যাসিবাদ ও কম্যুনিজমের হাত থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বাঁচাতে পারে কিন্তু হায়, সেই উদারতন্ত্রেই অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। গত দুশো বছরে ম মনীষী এর গরিমা এবং অবক্ষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। শ্রীযুক্ত রা হুম্‌বোল্ট, শাপিরো, স্যাবাইন, সালভাদোরি, হ্যালোয়েল, ক্যাসিরার, হবহাউ বুকহার্ট প্রভৃতি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, খ্রীষ্টীয় চিন্তায় পাপবো মানুষকে পাপগ্রস্ত, ঈশ্বরে আপন্ন করে রেখেছিল। (অর্থাৎ তারা ধর্মে মৌমাছিতন্ত্রে ছিল।) চতুর্দশ শতক থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে সংঘটি রেনেসাঁস মানুষকে সেই পাপবোধ থেকে মুক্তি দিল। গ্রীক সভ্যতার পু পুনর্মূল্যায়নে 'প্রভুহীন মানুষের' ('Masterless man', Sabine) আবির্ভাব রেনেসাঁসের 'Autonomous individual' হলো বৈশ্বিক মানুষ (universal man), যুক্তি বুদ্ধির পরে যার প্রতিষ্ঠা। তারপর যন্ত্রশিল্পের প্রসারে ঘটেছে শক্তির কেন্দ্রীকরণ, পজিটিভিস্টদের সমাজচিন্তায় ব্যক্তিত্বের সংকোচন, ব্যবসায়ীদের মুনফাস্বার্থে উদারতন্ত্রের বৈষয়িক দিকে প্রাধান্য ইত্যাদির ফলে উদারতন্ত্রে অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। বৈশ্বিক মানুষ হয়েছে বৈষয়িক মানুষ (economic man)। শ্রীযুক্ত রায় বিশ্বাস করেন, "একদিকে মানবতান্ত্রিক শিক্ষা এবং অন্যদিকে সামাজিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা ব্যক্তিকে স্বপ্রতিষ্ঠ, জিজ্ঞাসু, পরমতসহিষ্ণু এবং সমবায়ী করে তুলতে পারলে তবেই এযুগে উদার-তন্ত্র আবার প্রভাবশালী সমাজদর্শন হয়ে উঠবে।" ইতিহাসের দিক থেকে

কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগে। (১) বৈশ্বিক মানুষের বাস্তব অস্তিত্ব কবে, কোথায় ছিল? (২) উদারতন্ত্রের অভ্যুদয় যেমন ঐতিহাসিক কারণে ঘটেছে, তেমন বুর্জোয়া লিবারালিজমের অগ্রণীভূমিকা ঐতিহাসিক কারণেই শেষ হয়ে গেছে, শ্রীযুক্ত রায় যতই শিক্ষিতমানুষদের মূঢ় নির্বোধ বলুন, সে-কাল আর ফিরিয়ে আনা যায় না। (৩) রেনেসাঁসের মানুষের 'স্বতঃসিদ্ধ অধিকার', সর্বজনীন প্রকৃতিই বা কি? অধিকার সম্পর্কিত ধারণা যুগ-বদলের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না? (৪) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলেই বহু সমস্যার সমাধান হয়, এ ধারণা নতুন নয়। রাষ্ট্রের অখণ্ড সার্বভৌম শক্তির প্রতিবাদে বহুত্ববাদীদের মতামত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই জ্ঞাত। কিন্তু স্মরণীয় যে হ্যারল্ড ল্যাস্কি বহুত্ববাদী হয়েও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এই মতবাদেও আস্থা হারান।

নানা গ্রন্থকারের রচনাংশ উৎকলন করে উদারতন্ত্রের বিবিধ সংকীর্ণতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের ব্যাপারটি লেখক যথেষ্ট যুক্তিসহ আলোচনা করেছেন।

'গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে নানা গ্রন্থকারের সাহায্যে গণতন্ত্রের ইদানীন্তন বিকৃতির রূপ তুলে ধরা হয়েছে। সংবাদপত্রে এবং জনমত প্রকাশের অন্যান্যক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের প্রভাব গণতন্ত্রের বহিঃকাঠামো বজায় রেখে গণতন্ত্রী সংস্কৃতির গভীর মর্মমূল পর্যন্ত কলুষিত করছে। তাই 'টাইমস্' বা 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এর চেয়ে গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকায় 'ডেলি মিরর'-এর বিক্রি বেশি। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকরা পর্যন্ত আদর্শভ্রষ্ট। তবু শ্রীযুক্ত রায় বুর্জোয়া ডেমোক্রাসিতে আস্থা হারান নি। তাঁর মতে আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রমুখী ধরন বদলালেই ব্যাধির প্রতিকার হবে। কিন্তু এখানেও ইতিহাসের নজির ('ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতা', 'ঐতিহাসিক নিয়তি' লেখকের অপছন্দ হলেও) মানতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্রে আর সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ হতে পারে না, তাহলে একধরনের সামন্ততন্ত্রে পৌছতে হয়। কল্যাণরাষ্ট্রের কেন্দ্রমুখিতা যেন কেন্দ্রসর্বস্বতা না হয়, সেটাই দ্রষ্টব্য। বিকেন্দ্রীকরণের রাষ্ট্র হলেই যে বুদ্ধিজীবীরা সৎ হয়ে সদাশয় মানুষ নিয়ে আদর্শ সমাজ গড়তে পারবে—এই ধারণার মূলে সদিচ্ছা ভিন্ন যুক্তি নেই।

'চার্চ, রেনেসাঁস ও মানবতন্ত্র'ও পূর্ব-প্রবন্ধের মতো উক্তি সংকলনে সমৃদ্ধ। এখানে আছে বিউরি, সেণ্ট অগাষ্টিন, গিবন, বেনেস, হিট্টি, রোজার লয়েড,

লী, ভাসারি, এ্যাবট্ ফিশার প্রভৃতি লেখকদের থেকে রেনেসাঁসের যুগবৈশি
ব্যক্তির বহুমুখী মূল্যস্বীকৃতি, চার্চের প্রতিকূল শক্তি, ব্যক্তি্বাতন্ত্র্য
এবং উদারতন্ত্রের মানবতাবোধ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। 'মৌমাছি
প্রবন্ধের পরিপূরক ভাবনা আছে এই প্রবন্ধে। অনেক সুবিদিত ব্যা
প্রমাণের উৎসাহে বহু তথ্য তথা উদ্ধৃতি সমারোহ (এ প্রবণতা অন্য প্র
গুলিতেও কমবেশি লক্ষণীয়) প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। আ
বলি শ্রীযুক্ত রায়-কথিত মানবতন্ত্র স্বয়ম্ভূ বা কারো স্বকপোলকল্পিত কিছু
ইতিহাসের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতেই তার অভ্যুদয়, আবার ঐতিহাসিক কার
তার অবক্ষয়। ১৩১ থেকে ১৫২ পৃঃ পর্যন্ত রেনেসাঁসের একক মানুষ, অ
মানুষ, বৈশ্বিক মানুষের পরিচয় এবং মানবতন্ত্রী চিন্তার বিবৃতি আছে। প্রব
শেষে আবার সেই যন্ত্রের প্রসার, শক্তির কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে লেখক অনী
প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রবন্ধের তুলনায় এখানে অবশ্য মনোভাব
বিরোধী নয়। "যন্ত্র অথবা জনসাধারণ কোনোটি থেকে মুখ ফেরালে মান
তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। মানুষের বিকাশের জন্য যন্ত্রকে কাজে লাগাতে হবে
কিন্তু কে নির্ধারণ করবে সেই সীমা, যাতে যন্ত্রপাতি মানুষের প্রভু হবে ন
এজন্যেই বুর্জোয়া ডেমোক্রেসি ছেড়ে শ্রমিক-কৃষক অভ্যুত্থানের পথে ব্যক্তি
তথা মনুষ্যত্বের মুক্তির ইঙ্গিত খুঁজতে হয়। মানবেন্দ্র রায়-পন্থী শ্রীযুক্ত রা
অবশ্য রেনেসাঁস তত্ত্বেই সমস্যার একমাত্র সমাধান দেখেন।

আধুনিক জাপানী সাহিত্য

প্রদ্যোৎ গুহ

হাল আমলের মার্কিন প্রচারপুস্তিকায় কমাডোর পেরীকে যতই না কেন শান্তির দূত হিসেবে চিত্রিত করা হোক, আসলে তাঁর প্রশান্ত মহাসাগর অভিযান যে রাজনৈতিক দস্যুতাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই তা জানেন। কিন্তু তবু একথা স্বীকার্য বলদর্পী মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের স্বার্থে ১৮৫৪ সালে কমাডোর পেরী জাপানের উপর যে অসম চুক্তি চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

সন্দেহ নেই লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই জাপানের 'রুদ্ধ দরজা ভেঙেছিলেন কমাডোর পেরী। কিন্তু সেই দরজা দিয়ে লুঠেরারা যেমন ঢুকেছিল, তেমনি ঢুকেছিল পশ্চিমের কিছু আলো-বাতাসও। প্রাচ্যাভিমানীদের ঠুনকো অভিমানে হয়তো ঘা লাগবে, তবু সত্যের খাতিরে বলতেই হয়, উনিশ শতকের শেষার্ধে পশ্চিমের অভিঘাতেই জাপানে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল, প্রায় আড়াই শ বছরের কষ্টলালিত নিঃসঙ্গতার অবসান ঘটেছিল। এদিক থেকে দেখলে কমাডোর পেরী "ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র" হিসেবে কাজ করেছিলেন বলা যায়।

অবশ্য জাপান হয়তো পশ্চিমী মদ একটু বেশি পরিমাণেই গলধঃকরণ করেছিল এবং তার বিষময় পরিণাম আমাদের ভালো করেই জানা আছে।

কিন্তু সে যাই হোক, একথা তবু সত্য, পশ্চিমের অভিঘাতেই জাপানের স্থবির প্রাচ্যসমাজদেহে গতির সঞ্চার হয়েছিল। তারপর মাত্র চল্লিশ বছরের মধ্যে পশ্চাদপদ, অবজ্ঞাত জাপান কী করে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হলো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায়, শিল্প-বাণিজ্যে কী করে সে পশ্চিমের

Edited by Donald Keene. Modern Japanese Literature. Thomas & Hudson, London. 35 sh.

Junichiro Tanizaki. The Key. Sacker & Warburg, London. 12sh. 6d.

Osamu Dazai. The Setting Sun. Rupa & Co., Calcutta. Rs. 2.75 n.P.

উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে লাগল তা এ-যুগের অ বিস্ময়।

এই গতির বেগ সঞ্চারিত হলো সাহিত্যেও, আর তারই ফলে জাপানী সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটল, সূচনা হলো আধুনিক যুগের।

প্রায় আড়াই শ বছর কাল বাইরের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে বসেছি জাপান। ফলত জাপানী সাহিত্যের প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়েছিল সাহিত্য বলতে তখন যা লেখা হতো তা ছিল নিছক পর্নোগ্রাফি। এমন কি আঙ্গিকের দিক থেকেও সে সাহিত্য ছিল শিথিল। কিন্তু মেইজি রাজতন্ত্রের পুনরাভিষেকের মাত্র চল্লিশ বছরের মধ্যে পশ্চিমের সংস্পর্শে জাপানী সাহিত্যের মরাগাঙে নতুন প্রাণের জোয়ার এলো। রোম্যান্টিক থেকে সিম্বলিস্ট, পশ্চিমের প্রতিটি সাহিত্য-আন্দোলনের ধারা এসে মিশল নতুন সঙ্গমে। জাপানী সাহিত্য হয়ে উঠল জটিল, ভাবগর্ভ ও প্রাণবন্ত। সহস্রবার কথিত স্ফূর্তিবাজ যুবা আর বারবণিতার প্রণয়কাহিনীর স্থলে আবির্ভূত হলো মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

জাপানী সাহিত্যের এই নব জাগরণের জন্য বাইরের প্রভাবই সম্পূর্ণরূপে দায়ী, একথা বলা অবশ্য ভুল হবে। অন্তরের তাগিদ না থাকলে কখনও কোনো সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। জাপানী সাহিত্যের এই কালান্তরের পিছনে অন্তরের তাগিদ ছিল বইকি!

উনিশ শতকের শেষার্ধে জাপানে দ্রুত শিল্পায়ন হচ্ছিল। তার ফলে সমাজ এবং জীবনযাত্রার ধরনে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। আর সাহিত্য যেহেতু আকাশকুসুম নয়, মানসকুসুম এবং মন বাস্তবজগতের প্রভাবাধীন—তাই সাহিত্যেও এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! এই নতুন বাস্তবতা, নতুন মূল্যবোধকে রূপ দিতে গিয়ে জাপানী সাহিত্যিকেরা সামনে একটা তৈরি আদর্শ পেয়েছিলেন আর তাই কিছুকাল তাঁরা পশ্চিমী আদর্শের উপরই দাগা বুলিয়েছেন, তাদের অনুকরণ করে গল্প-কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের প্রয়াস ছিল আন্তরিক এবং সাধনা কঠোর তাই শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের নিজস্ব পথটা খুঁজে নিতে পেরেছেন।

একটি সংকলনের উপর নির্ভর করে, তা সে সংকলন যতই প্রতিনিধিত্ব-মূলক হোক, কোনো একটা দেশের সাহিত্য সম্পর্কে রায় দিতে যাওয়া সমীচিন

নয় এবং সে প্রয়াসও এখানে করা হচ্ছে না। তবু ডোনাল্ড কীন সম্পাদিত এবং 'ইউনেস্কো'র সহযোগিতায় প্রকাশিত আধুনিক জাপানী সাহিত্যের আলোচ্য সংকলনটিতে ও-দেশের সাহিত্যের যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তাতে একথা নির্ভয়ে বলা যায় উৎকর্ষ বিচারে বিশ্বের যে কোনো দেশের আধুনিক সাহিত্যের তা সমকক্ষ। বিশেষ করে জাপানী ছোটগল্প সত্যই বিশ্বের যে কোনো দেশের ছোটগল্পের সঙ্গে তুলনীয়।

সংকলনটি কতটা প্রতিনিধিত্বমূলক তা অবশ্য বলা শক্ত। তবে জাপানী সাহিত্যের যে দু-চারটি নামের সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল তাদের সকলের লেখাই আছে সংকলনটিতে। তদুপরি যখন এমন কি 'প্রলেতারীয় সাহিত্য'-এরও অন্তত একটি নিদর্শন সংকলিত হয়েছে তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে সম্পাদক খুব বেশি একদেশদর্শিতাদুষ্ট নন। ভূমিকায় জাপানী সাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন সম্পাদক তাতেও নিরপেক্ষতা বজায় রাঁখার প্রয়াস চোখে পড়ে। তবে প্রলেতারীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে তিনি যখন লেখেন: "The proletarian literature movement of the twenties occupied the attention of many young authors, and has since been rediscovered and extravagantly admired. Viewed by any normal standard of literature, however, its productions were remarkably poor." তখন সেই মন্তব্যের সত্যাসত্য বিচারের কোনো উপায় থাকে না। কেননা প্রলেতারীয় সাহিত্যের যে নিদর্শনটি ('The Cannery Boat': Takiji Kobayashi) সংকলনে নেওয়া হয়েছে তা একটি উপন্যাসের অংশ মাত্র। তবে সম্পাদকও স্বীকার করেছেন:

"The great virtue of proletarian writings was that they dealt with aspects of Japan largely ignored by more famous writers."

সাকুল্যে তিরিশটি গদ্য-রচনা আলোচ্য সংকলনে একত্রিত করা হয়েছে। এর মধ্যে নাটক আছে একটি। তা ছাড়া ছয়টি স্তবকে কিছু আধুনিক এবং জাপানী ধারার কবিতা সংকলিত হয়েছে। স্পষ্টতই নাটক এবং কবিতা এই সংকলনে কিছুটা অবহেলিত হয়েছে। এর কৈফিয়ৎ হিসাবে সম্পাদক বলেছেন:

"On the whole modern Japanese drama and poetry h not been the equal of the novels, short stories and o works of prose. There are some remarkable exceptions, one cannot escape the feeling that drama and poetry have to reach their full maturity."

আলোচ্য সংকলনে অন্তত যে নাটকটি এবং যে ক-টি কবিতা চয়ন হয়েছে তাতে এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহের অব থাকে না।

সংকলনের তিরিশটি গদ্য রচনার সম্যক বিচার এই আলোচনার পরিসরে সম্ভব নয়, তাই জাপানী কথাসাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ চোখে পড়ল তার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আপাতত নিবৃত্ত হ

আধুনিক জাপানী গল্পের আঙ্গিক নৈপুণ্য এমন কি অত্যন্ত অ পাঠকেরও চোখে পড়বে, বিশেষ করে জুনিচিরো তানিজাকি, 'রসোমন' লেখক আকুতাগাওয়া রুনোস্কে প্রভৃতির রচনায়—কিন্তু তাই বলে জাপ গল্প আঙ্গিকসর্বস্ব নয়। দ্বিতীয়ত, আঙ্গিক নৈপুণ্য সত্ত্বেও এই গল্পগুলি এমন এক ধরনের সরলতা আছে যা মনকে স্নিগ্ধ করে। কিন্তু আ কাছে জাপানী কথাসাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে অভিনন্দনযোগ্য মনে হয়েছে তা হলো অধিকাংশ গল্পেই লেখকের একটা দার্শনিক দৃষ্টিভ পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক গল্পেই স্পষ্টত নৈতিক সমস্যা উত্থাপন হয়েছে (যেমন ধরা যাক, 'Han's Crime' গল্পটি) কিন্তু তাই বলে গল্প হি তা অসার্থক নয়।

এই সংকলনের গল্পগুলি পাঠ করে আরও একটি কারণে আশ্বস্ত করলাম তা এই যে দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে জাপানে যে উদ্ধত জঙ্গীব অপ্রতিহত আধিপত্য সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের শংকার কারণ দাঁড়িয়েছিল জাপানী সাহিত্যে তার প্রভাব পড়েছে সামান্যই। নো পুরস্কারপ্রাপ্ত নোগুচির অনুগামীদের সংখ্যা যে নগণ্য ছিল তা জানতে জাপানী সাহিত্যিকদের মানবতাবোধের উপর আস্থা বাড়ল। সংক বরং এমন কয়েকটি গল্প চোখে পড়ল যা স্পষ্টতই যুদ্ধবিরোধী। বি করে Tayama Katai-এর 'One Soldier' গল্পটি শান্তিবাদী সাহিত্যের এ উজ্জ্বল নিদর্শন।

১৮৬৮ সাল থেকে হাল আমল পর্যন্ত জাপানী সাহিত্যের বিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট ধারণা এই সংকলন থেকে পাওয়া যায়। সংকলনটির সবচেয়ে বড় সার্থকতা এইখানেই।

এই সংকলনটি জাপানী সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যতখানি আশান্বিত করেছিল ঠিক ততখানিই হতাশ করল জুনিচিরো তানিজাকি-র 'The Key' উপন্যাসটি।

জুনিচিরো তানিজাকি জাপানী সাহিত্যের একেবারে প্রথম সারির লেখক। ১৯৪৯ সালে তিনি রাজকীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। কোনো কোনো পশ্চিমী সমালোচক তার সম্পর্কে এমন কথাও বলেছেন যে: "If any Japanese writer is awarded the Nobel Prize in the course of the next few years, it will be in all likelihood Tanizaki." কিন্তু পশ্চিমী সমালোচকের এই উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও সবিনয়ে বলতে হচ্ছে, তানিজাকি খুব বড় লেখক হতে পারেন কিন্তু আলোচ্য উপন্যাস তাঁর কোনো মহৎ শিল্পকর্ম নয়।

একটি অসুস্থ মানসিক বিকার এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কাহিনীর ছকে এই বিকারের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক আর সব তথ্যই বর্জিত হয়েছে। প্রায় দুশো পৃষ্ঠার উপন্যাসটি আদ্যোপান্ত পাঠ করার পরও বিস্মিতভাবে আবিষ্কার করতে হয় উপন্যাসের নায়কের নাম আমাদের অজানাই থেকে গেছে, অপর তিনটি চরিত্র সম্পর্কেও আমরা খুব অল্পই জেনেছি।

কাহিনীর ছক মোটামুটি এই রকম: জনৈক মধ্যবয়সী অধ্যাপক আবিষ্কার করেন তাঁর যৌন ক্ষমতা ক্ষীয়মান কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তাঁর আকর্ষণের তীব্রতা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি। অধ্যাপকের স্ত্রী যদিও একান্ত ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ কিন্তু সেকেলে ধরনের শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব তাঁকে এতটা যৌনশীতল করে তুলেছে যে অধ্যাপক কখনো তাঁকে পুরোপুরি উদ্দীপিত করতে পারেন নি। যৌবনের প্রান্তসীমায় এসে তিনি আবিষ্কার করেন ঈর্ষা এবং আত্ম-সম্মোহন মাদক অপেক্ষা অনেক বেশি যৌন-উত্তেজক এবং এরই প্রভাবে অবশেষে তিনি স্ত্রীর যৌন-জড়তা ভাঙতে সক্ষম হচ্ছেন। যাতে এই উত্তেজনা স্থায়ী হয় সেই উদ্দেশ্যে কন্যার প্রণয়ীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হবার জন্যে পরোক্ষে স্ত্রীকে উৎসাহ দিতে থাকেন অধ্যাপক।

অধ্যাপক তাই একটি ডায়েরি রাখতে শুরু করেন। তিনি জানেন স্ত্রী লুকিয়ে লুকিয়ে এই রোজনামচা পড়বে। স্ত্রীও ডায়েরি রাখেন তিনিও জানেন স্বামী তা পড়বে। এইভাবে প্রথমে স্ত্রী, পরে কন্যা তার প্রণয়ী নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে হয়ে ওঠে অধ্যাপকের সহযো অধ্যাপক ব্লাড-প্রেসারের রোগী। তাঁর পক্ষে এই ধরনের উত্তে মারাত্মক। কিন্তু ডাক্তারের সতর্কবাণী তিনি উপেক্ষা করেন। শেষ প যৌনকর্মে লিপ্ত অবস্থায় স্ট্রোকে তিনি মারা যান; বলা যায়, বিকৃ উপাসনায় শহীদ হন। অধ্যাপকের মৃত্যুর পর "মুখ রক্ষার জন্য" কন্যার প্র কন্যাকেই বিবাহ করে কিন্তু অধ্যাপকের স্ত্রীর ডায়েরি থেকে যথেষ্ট আভা পাওয়া যায়, যতদিন তারা জীবিত থাকবে ততদিন তাদের বিকৃত যৌনলী অব্যাহত থাকবে।

আগাগোড়া অধ্যাপক এবং তাঁর স্ত্রীর ডায়েরির মধ্য দিয়ে কাহিনী বলা হয়েছে এবং কাহিনী-বয়নে তানিজাকি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই উপন্যাস লেখার সার্থকতা কি? জ্যাকেটে প্রকাশকে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে তানিজাকি "অস্বাভাবিক যৌন ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা একজন বিশেষজ্ঞ।" এমন একটি বিকৃত কাহিনী রচনায় সে বিশেষ জ্ঞা প্রয়োগ না করলে কি কিছু ক্ষতি ছিল? বইটি শেষ করবার পরও অনেকক্ষ পর্যন্ত মুখের বিস্বাদ দূর হয় না।

শিল্প-বিপ্লব যে সকলের পক্ষে অবিমিশ্র আশীর্বাদরূপে দেখা দেয় নি কারো কারো পক্ষে অনেক স্বেদ এবং অশ্রু বর্ষণের কারণ হয়েছে 'The Setting Sun'-এ তার একটি মর্মস্পর্শী আলেখ্য পাওয়া যায়। 'The Modern Japanese Literature'-এ একই লেখকের 'Villons Wife' পড়ে বিস্মিত হয়েছিলাম, 'The Setting Sun' তাঁর শক্তিমত্তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ করল এবং সেই সঙ্গে আক্ষেপও হলো যে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে এ লেখক আত্মহত্যা করেছেন।

সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে একটি সূর্যাস্তের কাহিনী 'The Setting Sun' এই সূর্যাস্ত অভিজাততন্ত্রের। যুদ্ধোত্তর যুগে একটি অভিজাত পরিবা কেমন করে ধাপে ধাপে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেল অসামু দাজাই তা একটি সংবেদনশীল আলেখ্য রচনা করেছেন। কিন্তু 'The Setting Sun'

তাই বলে শুধু একটি পরিবার বা শ্রেণীর অবক্ষয়ের কাহিনী নয়—যা [illegible] তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে তা হলো রূপান্তরকালীন মূল্যবোধের বিপর্যয়ের রূপায়ণ।

নায়িকা কাজুকো-র জবানিতে বলা হয়েছে কাহিনীটি। ছ-বছর আগে তার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। বাবার মৃত্যুর পর টোকিওর সুন্দর বাড়িটি ছেড়ে তারা গ্রামে এসে থাকতে বাধ্য হয়েছে। এই সময় যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে কাজুকো-র ভাই নাওজি। দেহ-মনে বিপর্যস্ত নাওজি স্বশ্রেণী থেকে অন্যশ্রেণীতে অবনমনকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না—নিজেকে সে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করে। নাওজি মারফৎ একজন অমিতাচারী ঔপন্যাসিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কাজুকো-র। বিশৃঙ্খল, শূন্য পৃথিবীতে মানসিক নিরাপত্তার সন্ধানে কাজুকো ঐ ঔপন্যাসিককে রাজি করায় তার সন্তানের জনক হতে। কিন্তু এই মানসিক নিরাপত্তাবোধ কি সে অর্জন করতে পারে? —পারে না, তাই 'The Setting Sun' ট্রাজিক মাধুর্যমণ্ডিত।'

উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে অনেক কান্না, অনেক দীর্ঘশ্বাস জমা হয়ে আছে আর তার ঘনীভূত অভিব্যক্তি হয়েছে কাজুকো-র চিঠির এই লাইনটিতে:

"Victims. Victims of a Transitional period of morality. That is what we···certainly are."

হয়তো যুদ্ধবিধ্বস্ত, মার্কিন পদানত জাপানের আর্তিই বাণীরূপ পেয়েছে কাজুকো-র এই লাইন ছুটিতে।

তিনজন সাম্প্রতিক ইংরেজ কবি

মৃগাঙ্ক রায়

প্রধান আধুনিক টি. এস. এলিয়টের যশঃসূর্য সম্প্রতি নিম্নগামী। ক
সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহও এখন ক্ষীয়মাণ। এই কিছুদিন আগে অক্সফোর্ডে কা
অধ্যাপক নির্বাচনে প্রার্থী হতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করে তিনি বলেছেন, ক
সম্বন্ধে তাঁর কিছু বলার নেই। এ কথা নিরুৎসাহের, বিশেষত যখন কো
কবি উচ্চারণ করেন। এলিয়ট পরবর্তী অডেন-স্পেণ্ডার-ডেল্যুই গো
খ্যাতিও এখন নির্বাণোন্মুখ। তারপর ডিলান টমাসের বিস্ময়কর প্রতি
এবং ততোধিক বিস্ময়কর খ্যাতি। তাও বর্তমানে নিম্নগামী। বছর
তিন আগে হঠাৎ জন বিটজামিনের কাব্যগ্রন্থ অজস্র বিক্রিত হয়ে সক
চমকে দিয়েছিল। অবশ্য তাঁর খ্যাতির শিকড় নাকি রাজপরিবার
শোনা গেছে, প্রিন্সেস মার্গারেট তাঁর ভক্ত পাঠিকা।

এই তালিকার পরিবর্তী কবিরা, বয়সে যাঁরা তরুণ হবেন বলেই অনু
করছি, এখনো স্বল্প পরিচয়ের হালকা অন্ধকারে বাস করছেন। তাঁ
অধিকাংশকেই আমরা নামোল্লেখমাত্র চিনতে পারি না, যেমন পারি তিরি
অধিকাংশ কবিকে। বয়সের তারুণ্যই তার কারণ নয়, হয়তো তাঁরা ন
সুরসংযোজনায়ও অপারগ বলে। প্রতি দশকে নতুন বিদ্রোহ যোজনা ক
একালের নিয়ম, সুতরাং এঁরা যথারীতি বিদ্রোহী, উড্ডীন পতাকা শো
এবং 'এ্যাংরিজ' নামক সেই হাস্যকর বিশেষণে চিহ্নিত। এঁরা পূর্বপ
কবিদের মতো রাজনীতি, দর্শন ইত্যাদি বিষয়মগ্ন হতে নারাজ, কিন্তু কো
বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীও নন। সমবেত আন্দোলন যেটুকু আ
তা প্রধানত নেতিবাচক, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিও অনায়া
লক্ষ্য নয়। সব মিলিয়ে সাম্প্রতিক ইংরেজী কবিতায় নৈরাজ্য এ
ধ্যানহীনতাই প্রবল বলে মনে হয়। অন্তত আলোচ্য গ্রন্থের * তিন

* Kingsley Amis, Dom Moraes, Peter Porter. Penguin Modern Po
2/6 Sh.

সাম্প্রতিক কবি কিংসলে অ্যামিস, ডম মোরেস এবং পিটার পোর্টার এ বক্তব্যের সমর্থন ।

এই তিনজন কবি কিসের প্রবক্তা? প্রায় কিছুরই নয়। নানা দৃশ্যাবলী এবং মুডের ওপর এঁদের নির্ভর। এঁদের উপলব্ধি ধ্যানগত নয়, সুতরাং জীবন এবং বিশ্ববিধানের পরিমণ্ডল এঁদের দৃষ্টির বাইরে। বর্তমান, খুবই নিকট অবস্থিতির অনুভব এঁদের আলোড়িত করে, তার মূল সন্ধানে এঁরা ব্রতী নন। অবশ্য একটা বৈশিষ্ট্য কিছুতেই নজর এড়াবার নয়। সে হচ্ছে, আধুনিক জীবন সম্বন্ধে তিক্ততা বোধ। তিনজনই কমবেশি সেই বোধে বিচলিত, বিশেষত পিটার পোর্টার। এই তিক্ততা প্রমাণ করে যে এঁরা জীবনলগ্ন। সমাজের অন্তত কিছু কিছু ব্যাপার, ঘটনা এঁদের নাড়া দিয়েছে, প্রহার করেছে এবং এঁরা পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু সেই সঙ্গে—তিক্ততার অগভীরতা, ক্ষীণাঙ্গ চারিত্র্যও লক্ষণীয়। যে সব কারণে এঁরা তিক্ত তার মূলসন্ধানে কেউ আগ্রহী নন, তার বিষম পশ্চাতপট উন্মোচনে নিরুৎসাহী। ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই শিকড়হীন উদ্ভিদের মতো। তিক্ততা পিটার পোর্টারের কবিতায় শ্লেষের সঞ্চার করেছে, যদিও তা দুর্বল, একেবারে স্বাদহীন না হলেও। যেমন :

Love goes as the M. G. goes.
The Colonel's daughter in blak stockings, hair
Like sash cords, studies art,
Goes home once a month. She won't marry the men
She sleeps with,

বর্ণনা নিখুঁত, শ্লেষাত্মক, কিন্তু কোনো বৃহৎ বোধসম্পৃক্ত নয়। তুলনায় কিংসলে এ্যামিস এবং ডম মোরেসের কবিতায় তিক্ত স্বাদ অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু অনুপস্থিত নয়। যেমন :

Of course, I know ivy will sweetly plump
Itself all over, shyly barge into crannies,
Pull down lump after elegiac lump,
Then hastefully screen ruin from our eyes.

কিংসলে অ্যামিস

বলাই বাহুল্য, এঁরা একালের কবি। কালপরিমাপে এঁরা আধুনিক
অনুসঙ্গী। কিন্তু এঁদের কারো কবিতায় তার প্রমাণ বিশেষ স্পষ্ট
বক্তব্যের দিক থেকে যে একেবারেই নয় তা আগেই বলেছি। প্র
ভঙ্গিতেও তার সাক্ষ্য খুব একটা দৃষ্টিগোচর নয়। প্রতীক এবং ইমে
ব্যবহার প্রায় অনুপস্থিত। পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা এবং প্রকাশের স্ব
দৃঢ়বদ্ধতা দুর্লক্ষ্য। ফলে অধিকাংশ কবিতাই জলবৎ, অনুভবের উপরিত
ছলছলানি। টি. এস. এলিয়ট বা অডেন প্রমুখদের পরবর্তী পর্যায়ে এ ধ
বুদ্ধিহীন তারল্য অচিন্ত্যনীয়। কোনো কোনো কবিতা যেমন কিংসলে এমি
'Ode to the East-North-East-by-East Wind' নামকরণের চা
ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর স্মারক। পিটার পোর্টারের ঝোঁক কথক
গল্পে। কিন্তু কোনো গল্পই প্রতীকধর্মী নয়। কিছু ঘটনা, নিছক চ
কথোপকথন ইত্যাদি। এসব গল্প প্রগাঢ় কাব্যে এবং আধুনিকতায়
হতে পারত প্রতীকী চরিত্রের অধিকারী হলে। তবু পিটার পোর্টা
এই বিশেষ ঝোঁকটুকু তাঁকে একটু স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। কিংসলে এমি
বা ডম মোরেস কোনো বৈশিষ্ট্যেরই অধিকারী নন। এঁদের কারো কো
কবিতাই পাঠককে বিস্মিত বা মুগ্ধ করে না, একটি লাইনও হঠাৎ চম
দেয় না। তবে যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিরঙ্কুশ উল্লেখ নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ।

এঁরাই যদি সাম্প্রতিক ইংরেজী কবিতার প্রতিনিধি হন তাহলে
অনুর্বর কাল অবশ্যই বেদনাদায়ী।

একটি স্বপ্নের প্রতীক্ষায়

কৃষ্ণ ধর

অস্ট্রেলিয়া আমাদের এশীয় পরিমণ্ডলের কাছাকাছি। কিন্তু খুব বেশি কিছু জানা নেই এই প্রত্যন্ত মহাদেশের মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা আর সমাজের কাহিনী। অস্ট্রেলিয়ার আদি-মানুষ আর নতুন-মানুষ উভয়ের জীবনের গভীরে যে আশ্চর্য সামঞ্জস্য আছে ; সংগ্রামের বেদনায়, জয়ের আনন্দে, মানবিকতার প্রেরণায় দুটি ভিন্ন চরিত্রের উপন্যাসে* তারই পরিচয় আবিষ্কার করা গেল। আরেক অস্ট্রেলিয়ার চিত্র ফুটে উঠেছে এই দুটি উপন্যাসে। ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গদের কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে সাদা আর কালো যেখানে এক হয়ে মিশে গেছে, স্বপ্ন দেখছে এক মহৎ জীবনের, আকাঙ্ক্ষার, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই উপন্যাস দুটিতে। একজন দেখেছেন নারীর চোখ দিয়ে, আরেকজন দেখেছেন মানবতাবাদীর অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতে। একজন লিখেছেন শহরের সুতাকলের নারীশ্রমিকদের কাহিনী ('ববিন আপ'), আরেকজন অত্যন্ত মমতা নিয়ে রচনা করেছেন টোটেম আর টাবুর বেড়াজালে বাঁধা অথচ বলিষ্ঠ সরলমনা আদিবাসী মানুষের কথা ('সেভেন এমুস্') যাদের জীবনযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে চক্রান্তকারী শহুরে ঔপনিবেশিকদের স্থূল হস্তক্ষেপে। উপন্যাস দুটি যেন পরস্পরের পরিপূরক। কাহিনী আলাদা, স্থান আলাদা, সময়ও যেন বহু দূরের ব্যবধান। কিন্তু লেখক-দুজনের মন এক সুরে বাঁধা। তাই আলেকজান্দ্রিয়া সুতাকলের শ্রমজীবী নারী শার্ল আর সেভেন এমু স্টেশনের কাছে পশুপালন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ব্রোঙ্কো জোনস সম্পূর্ণ দুই জগতের অধিবাসী হলেও তারা একই জীবনের অভ্যন্তরে এক হয়ে মিশে গেছে। তারা শুধু অস্ট্রেলিয়ার নয়, আফ্রিকার, এশিয়ার কিংবা লাতিন আমেরিকার শ্রমিক মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন নিয়ে

---

*Dorothy Hewett. Bobbin Up. Seven Seas Publishers, Berlin. 2.50 n.P.
*Xavier Herbert. Seven Emus. Seven Seas Publishers, Berlin. 2.50 n.P.

উজ্জ্বল আগামীর জন্য অপেক্ষমান। এরা এ যুগের মানুষ। দেশের সীমান্ত পেরিয়ে এই উপন্যাস দুটি তাই বৃহত্তর জগতের পাঠকদের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছে। 'ববিন আপ'-এর কাহিনী অস্ট্রেলিয়ার একটি শহরের শ্রমিক নারীদের জীবনের বিচিত্র দিক অসামান্য উজ্জ্বলতায় প্রকাশ করেছে। লেখিকা ডরোথি হিউয়েট নিজে এদের সঙ্গে বাস করেছেন, কাজ করেছেন। তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করেছেন একটি গল্প যা জীবনের সমান্তরাল। তিনি ভালোবেসেছেন এই শ্রমিক নারীদের। তাদের জীবন সামান্য, জীবনের চাওয়াও সামান্য। কিন্তু এর মধ্যেই মাঝে মাঝে চমক দিয়েছে অসামান্যতার উপকরণ। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে গড়িয়ে যায় রাত্রি, রাত্রির বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতা ডেকে আনে সকালবেলার সূর্যকে। এর মধ্যেই কাটে ওদের জীবন, আসে ভালবাসা, অদর্শনের বেদনা। এরা সকলেই সাধারণ নারী আর পুরুষ। কিন্তু এই সাধারণের জীবনেই লেখিকা দেখিয়েছেন অসাধারণকে। সংগ্রাম, ধর্মঘট, জীবিকার গ্লানি, কখনো বা নীড় বাঁধার স্বপ্ন—কোনো কিছুই এ জীবন থেকে বাদ যায় নি। অথচ কী দৃঢ়মনা এই নারী শ্রমজীবীর দল। ওরা জানে আরেকটি জীবন আছে, কারখানার বাইরে, সমুদ্রতটে, শহরের প্রশস্ত রাজপথে, ওই দূরের মহাকাশে যেখানে মানুষের বৈজয়ন্তী স্পুৎনিক কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে অযুত সম্ভাবনাকে বক্ষে নিয়ে: "ভোর ৪'৩৬ মিনিট। ত্রিশ ডিগ্রীতে উত্তর পশ্চিম আকাশে ছুটে বেরিয়ে গেল স্পুৎনিক। শিশু পা ছুঁড়ল, পৃথিবী আবর্তিত হলো। আস্তে আওয়াজ হলো দরজা খোলার, মৃদু ফিসফিসানি আর একটি চুম্বন। ওলগা তার প্রেমিককে বিদায় দিল।" (পৃঃ ৪১) এ গ্রহের কান্না আর ভালোবাসাকে তিনি কী নিপুণভাবে সংযুক্ত করেছেন আরেক গ্রহের অজানিত সম্ভাবনার সঙ্গে। ("মাত্র একটি চুম্বন, একটি চুম্বন দাও আমার জন্মদিনে, লোকটি বলল"।) উনিশ বছরের কিশোরী শার্ল ভালোবেসেছে জ্যাক রয়কে। অভিজ্ঞতায় প্রবীণা মা ভায়োলেট তার মধ্যে আবিষ্কার করে আরেক জননীকে, শার্ল মা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। ব্যক্তিত্বের অনিবার্য সংঘর্ষ। ভায়োলেট জানে শ্রমিক নারীদের মা হওয়ার কী বেদনা। সে চায় না এই দারিদ্র্যের বিষণ্ণতায় তার মেয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করে। তবু সে জননী। মেয়ের স্বপ্নকে নষ্ট হতে দেয় না চিরকালের মমতাময়ী একটি নারী। কিন্তু শার্ল বাঁচাতে পারল না তার সন্তানকে:

"খুবই দুঃখিত ডেভি, সবটাই ভুল হয়েছে। তোমার জন্ম নেওয়াটাই ভুল। পৃথিবী সুন্দর, কিন্তু এখানে আমাদের জন্য কোনো সৌন্দর্য নেই। কারখানার চিমনির কালো ধোঁয়ায় আমরা আচ্ছন্ন হয়ে আছি। আমাদের সারাটা জীবন কারখানার একটি বাঁশি আর অন্য একটি বাঁশির আওয়াজের মধ্যে শৃঙ্খলিত, আবদ্ধ।" একথা বলেছিল শার্ল তার শিশু সন্তানকে। আরও কয়েকটি বিচিত্র নারীর কথা তিনি লিখেছেন, ডনি, হ্যাজেল, নিল। হ্যাজেল ডনির মা। ষোল বছর বয়সে যার বিয়ে হয়েছিল, তিনটি কন্যার জননী। যৌবন তার অযাচিত। কারণ সে জানে সব কিছুর পর একটা নির্মম বাস্তব সত্য তার জন্য অপেক্ষমান—টুপির কারখানা, মদের বোতল আর শীতল শয্যা। তবু তার চোখের দিকে তাকালে স্বপ্নের কথা মনে পড়ে, এখনও তার তারুণ্য নিঃশেষ হয়ে যায়নি। ডনির ভালো লেগেছিল কেন-কে। সমুদ্র সৈকতে, শহরের হোটেলে একত্রে রাত্রিবাস করেছে। ডনি চায়নি তার মায়ের মতো অকালে রিক্ত হয়ে যেতে। এদের মধ্যে আরেক আশ্চর্য নারী নেল। শ্রমিকদের জীবনে নতুন সম্ভাবনার কথা সে চিন্তা করত, এই তুচ্ছতা থেকে চেয়েছিল তাদের মুক্তি দিতে, তাদের সংগঠিত করতে। তার স্বামী স্ট্যানমুনি মার্কসিস্ট, শ্রমিক সংগঠনের নেতা। কোনো কিছুতেই তার হতাশা নেই। স্ট্যান জানে ভবিষ্যৎ রয়েছে এই শ্রমজীবী মানুষের জন্যই। নেলের জীবনধারাকে পরিবর্তিত করেছিল স্ট্যান। নেল এখন পার্টি সদস্যা। তার মনে স্বপ্ন শ্রমিক সংগঠনের একটি মুখপত্র প্রকাশ করা যার নাম হবে 'ববিন আপ'। পার্টি তাকে নতুন এক নারীতে পরিণত করল। এই নেলি ওয়েবারের চরিত্র অঙ্কনে লেখিকা আশ্চর্য মমতার পরিচয় দিয়েছেন। সমস্ত উপন্যাসে স্ট্যান ও নেল পরিণত মনের প্রতিফলন। শ্রম-জীবীদের মনে সাহস, সংকল্প আর গৌরব এনে দিয়েছিল নেল। তাই পেগকে বলেছিল ভ্যাল: "জানো পেগ, আমরা আকাশে ওই স্পুৎনিক উড়িয়েছি।"

"কী বলছো, তুমি আর আর আমি, টমি?" সে বললে, "খুব বেশি বড়াই হলো না।"

"আমরা যা কিছু করেছি, যে লড়াই করেছি, অল্প মজুরিতে কাজ করেছি, দুঃখের দিনগুলি, লড়াইয়ের দিনগুলি—যদি আমরা তা না করতাম, সোভিয়েত ইউনিয়ন আকাশে ওই উপগ্রহ পাঠাতে পারত না। আমরা, শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিই ওটাকে আকাশে তুলেছি।"

এই বিশ্বাস ও দৃঢ়তায় আলেকজান্দ্রিয়ার জামবাক মিলের নারী
ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জয়ী হলো। নতি স্বীকার করে
মালিককে। 'ববিন আপ' সেই সংগ্রামী নারীদের অত্যাশ্চর্য জীবনক
তারা সকলে, নেল, মিল, শার্ল, বেটি সবাই একস্বরে গেয়ে উঠল:
ছুনিয়াটা আমাদের হাতের মুঠোয়। 'ববিন আপ' শ্রমিকজীবনের
অত্যাশ্চর্য চিত্র।

'সেভেন এমুস' সম্পূর্ণ অন্য এক জগতের যবনিকা উত্তোলন ক
জেভিয়ার হারবার্ট এই উপন্যাসে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের জীবনের
আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যয়ের যে চিত্র এঁকেছেন তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্
গভীরতায় সমুজ্জ্বল। ডেম্পিয়ার বন্দরের উত্তরপশ্চিমের গ্রামাঞ্চলে পশ
কেন্দ্র সেভেন এমুস। সেভেন এমু নামটিও আদিবাসী লোকপ্রসিদ্ধি
নেওয়া। সভ্যতার আদিতে এই মানুষেরাই নিজেদের কল্পজগৎ
করেছিল, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নানা প্রতীকে, টোটেমে আ
সংস্কারকে রক্ষা করে রেখেছে সযত্নে। ক্যাঙ্গারু, এমু, নেকড়ে ইত
বিভিন্ন টোটেম-গোষ্ঠীতে আদিবাসীরা বিভক্ত। একদিন গেল সে
শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকের দল, পরাল তাদের হাতকড়া, দলিত মথিত
দিল পৃথিবীর আদি সন্তানদের। 'সেভেন এমুস'-এ নতুন দৃষ্টিতে তারই কা
বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রোঙ্কো জোনস্ এই সেভেন এমুসের প্রতিষ্ঠা
শ্বেতাঙ্গ পিতা আর আদিবাসী জননীর সন্তান ব্রোঙ্কো। সে ভালোবাসে
কৃষ্ণকায় আদিবাসীদের। সে তাদেরই একজন। ব্রোঙ্কোর ব্যবসায়ে
প্রবেশ করল অর্থলোভী শ্বেতাঙ্গ এপেলবি অন্ট। আভিজাত্যের জন্য
সে অঞ্চলে ব্যারন নামে পরিচিত। স্বপ্নাবিষ্ট সেভেন এমু-র গ্রাম প্রা
একদিন এলো একজন তরুণ নৃতত্ত্ববিদ, মিঃ ম্যালকম গোবোরো। এমু টো
সম্পর্কে গবেষণার আগ্রহ নিয়ে তিনি এলেন। কিন্তু এই সভ্যতাগর্বী শ্বে
নৃতত্ত্ববিদ এসে বোঙ্কোর জীবনের স্বপ্ন তছনছ করে দিল। সরল, নি
এমু জাতির প্রতীক যে 'ড্রিম স্টোন' তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে
তিনি জানেন এই আদিযুগের প্রস্তর সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে তার ভা
প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি। বাধা দিল ব্রোঙ্কো। এ উপন্যাস এই সংঘর্ষে
কাহিনী। এর মধ্য দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বেদনা, তা
নিপীড়ন আর যন্ত্রণার অশ্রুসিক্ত উপাখ্যান-আশ্চর্য দক্ষতায় রূপায়িত করে

লেখক হারবার্ট। নৃতত্ত্ববিদ বোঝাতে চান ব্রোঙ্কোকে যে আদিবাসীদের এই
পাথরটি সরিয়ে নিলে তাদের কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু সভ্যজগত সন্ধান
পাবে প্রায় কুড়ি হাজার বছরের প্রাচীন একটি প্রস্তরশিল্পের নিদর্শন। কিন্তু এ
য় এমু জাতির স্বপ্ন, তাদের বিশ্বাস, তাদের সব। ব্রোঙ্কো বলে : "Dreamin'
inish, people finish. Anyone got Dreamin' got strong heart
or livin'. Lose 'em Dreamin', you don't care, you die."

গোবোরো বলতে চান, "যাদের স্বপ্ন নেই, তুমি এবং আমি, তারা কি
াঁচে থাকে না?"

"আমার স্বপ্ন আছে। আমি বোল্‌গা জাতির। আমাদের সকলেরই
প্ন আছে, আমার পরিবারেরও।"

"কিন্তু আমার?"

"আপনার কথা আলাদা। আপনি শ্বেতাঙ্গ।"

বণিক সভ্যতার আক্রমণ থেকে ব্রোঙ্কোর মতো লোক আর কতদিন
াদিম মানুষের স্বপ্নকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু তারা পরাজিত হয়েও
াদি মানুষের প্রেরণাকে অনাদিকালের জন্য জাগিয়ে রেখেছে। এতে জাতি-
র নেই, আছে শোষক সভ্য মানুষের চরিত্র আর শোষিত আদি মানুষের
শ্বাসের এক বিস্ময়কর চিত্র। নৃতত্ত্ববিদ গোবোরো কিংবা ব্যবসায়ী ব্যারনের
াছে তারা মিউজিয়মের বস্তু, কিন্তু ব্রোঙ্কোর কাছে তারা পৃথিবীর আদি
দিবাসী যাদের উত্তরাধিকার এই ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গরা লুণ্ঠন করেছে।
াজকে আফ্রিকায়, আমেরিকায় এই উত্তরাধিকারচ্যুত সর্বস্বান্ত কৃষ্ণাঙ্গ
নুষদেরই জাগরণের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। 'সেভেন
মুস' তারই এক প্রতীকী কাহিনী।

বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনী

অমল দাশগুপ্ত

কাহিনীমাত্রই বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত, বিশেষ করে বিজ্ঞানের এই
অগ্রগতির যুগে তো বটেই। এই অর্থে কাহিনীমাত্রই বিজ্ঞানাশ্রয়ী।
গত এক শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে এমন কাহিনীও রচনা কর
বিজ্ঞান যেখানে শুধু প্রভাব নয়, পুরোপুরি আশ্রয়, বিজ্ঞানের ভূমিকা
অতি প্রত্যক্ষ, এমন কি বিজ্ঞানই যেখানে নায়কের ভূমিকায় অ
এ-ধরনের কাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছে সায়েন্স ফিকশন। ডিটেকটিভ
কাহিনীর বিস্তার যেমন একটি ক্রাইম বা অপরাধ উদ্ঘাটনের মধ্যে
সায়েন্স ফিকশনে তেমনি একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে অবলম্বন করার
দিয়ে। ডিটেকটিভ গল্পে যেমন অনেক সময়ে মানুষ থাকা সত্ত্বেও
অভাব, সায়েন্স ফিকশনেও তাই। তবে এমন ডিটেকটিভ গল্প অবশ্যই
(যেমন কোনান ডয়েল বা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়) যাতে ক্রাইম
কোনোটাই অনুপস্থিত নয়। সায়েন্স ফিকশন সম্পর্কেও একই
সায়েন্স ও ফিকশন, এই দুয়ের সার্থক সমন্বয়টি হওয়া চাই।

সায়েন্স ফিকশনের এই সংজ্ঞাকে মেনে নেবার পরেও প্রশ্ন
ইনভিজিবল ম্যান কি সায়েন্স ফিকশন? এই কাহিনীতে একটি
আবিষ্কারের ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা নিঃসন্দে
দেবেন, মানুষের শরীর কোনো অবস্থাতেই অদৃশ্য হওয়া সম্ভব নয়।
অসম্ভবক ব্যাপারটিই ঘটেছে। ফলে ব্যাপারটা আর বিজ্ঞানের
থাকে নি, হয়ে উঠেছে উদ্ভট কল্পনা বা ফ্যানটাসি। এই কারণেই এ
ওয়েলস-এর 'দি ইনভিজিবল ম্যান' ফ্যানটাসি শ্রেণীভুক্ত। ফ্যানটাসি
লেখা হবে, কিন্তু সায়েন্স ফিকশনের মর্যাদা তার প্রাপ্য নয়; তার
স্বতন্ত্র।

The Heart of the Serpent. Destination: Amaltheia. A Visit
Outer Space. Science-Fiction Library. Foreign Languages Pub
House, Moscow. প্রাপ্তিস্থান: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা-১২।

সায়েন্স ও ফ্যানটাসির সীমারেখাটা এত অস্পষ্ট যে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্যে আরো একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করা অবান্তর হবে না। মানুষের চাঁদে যাত্রা নিয়ে জুলে ভার্নের কাহিনী (ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন) প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে, আর এইচ. জি. ওয়েলস-এর কাহিনী (ফার্স্ট মেন ইন দি মুন) ১৯০১ সালে। জুলে ভার্নে তার নায়কদের চাঁদে পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন মস্ত একটি কামান দেগে। এইচ. জি. ওয়েলস পাঠিয়েছিলেন ক্যাভোরাইট নামে একটি মাধ্যাকর্ষণ-প্রতিরোধী পদার্থ আবিষ্কার করে। জুলে ভার্নে তাঁর কাহিনীতে প্রোজেকটাইল সম্পর্কিত নিখুঁত হিসেব উপস্থিত করেছিলেন। কতখানি বেগে, কোন সময়ে আর কী অবস্থার মধ্যে প্রোজেকটাইলটিকে কামানের গোলার মত উৎক্ষিপ্ত করা হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ জুলে ভার্নের লেখায় পাওয়া সম্ভব। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার, জুলে ভার্নের কল্পনার প্রোজেকটাইলটি রকেট-সমন্বিত। বায়ুশূন্য মহাকাশে প্রোজেকটাইলটিকে এই রকেটের সাহায্যে খুশিমতো নিয়ন্ত্রিত করা চলে। জুলে ভার্নের নায়করা অবশ্য চাঁদের মাটিতে অবতরণ করতে পারে নি। চাঁদকে একপাক ঘুরেই (সোভিয়েত কসমিক রকেটের মতো) আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। এইচ. জি. ওয়েলস এ-তুলনায় অনেক সহজ পন্থায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁর নায়করা চাঁদে যাত্রা করেছে 'ক্যাভোরাইট' নির্মিত ব্যোমযানের যাত্রী হয়ে। এই ব্যোমযানে বিভিন্ন দিকে জানলার ব্যবস্থা। কোনো বিশেষ দিকের জানলা খোলা থাকলে মাধ্যাকর্ষণের শক্তিও সেই বিশেষ দিকে টান মারতে থাকে—ফলে সেই বিশেষ দিকেই ব্যোমযান ধাবিত হয়। বিভিন্ন দিকের জানলা বিভিন্ন মাত্রায় খোলা রেখে ব্যোমযানের গতিকেও বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রিত করা চলে। গোটা ব্যাপারটিতে উদ্ভট কল্পনাশক্তির পরিচয় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু বিজ্ঞান নেই। গোটা ব্যাপারটিই অবৈজ্ঞানিক।

এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে, যে সব কাহিনী এতকাল সায়েন্স ফিকশন নামে আখ্যাত হয়ে এসেছে তার মধ্যেও দুটি বিপরীত ধারা বর্তমান। একটি বিজ্ঞানাশ্রয়ী, অপরটি কল্পনাশ্রয়ী। একটি সায়েন্স, অপরটি ফ্যানট্যাসি। একটির প্রতিনিধিত্ব করছেন জুলে ভার্নে, অপরটির এইচ. জি. ওয়েলস।

বলা হয়ে থাকে যে জুলে ভার্নের প্রত্যেকটি ভবিষ্যৎ-কল্পনা পরবর্তী কালে

বৈজ্ঞানিক সত্য হয়ে উঠেছে। কথাটা মিথ্যে নয়। সেই ১৮৬৫ সালেও তিনি মানুষকে চাঁদে পাঠাবার জন্যে যে ধরনের আয়োজন করেছিলেন, মূল বৈজ্ঞানিক ভিত্তির দিক থেকে তার সঙ্গে স্পুৎনিকের-যুগের আয়োজনের একেবারে অমিল নেই। তাঁর ভুলভ্রান্তি ও অপূর্ণতাগুলিও সমকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাপ্রসূত। এ-প্রসঙ্গে অন্য যে দৃষ্টান্তটি আজও বারেবারে উল্লিখিত হয়ে থাকে তা হচ্ছে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'টোয়েনটি থাউজেণ্ড লীগ্‌স আণ্ডার দি সী' উপন্যাসের নটিলাস। এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৭০ সালে। প্রায় একশো বছর পরে আজও এই উপন্যাসটি পাঠ করলে আজকের দিনের কোনো পারমাণবিক ডুবোজাহাজের গল্প পড়ছি মনে হয়। আজ যদি জুলে ভার্নে বেঁচে থাকতেন আর শুনতেন, যে-পারমাণবিক ডুবোজাহাজটি গভীর সমুদ্র থেকে একবারও গা না ভাসিয়ে সারা পৃথিবীকে চক্কর দিতে পেরেছে, এমন কি মেরুদেশের সমুদ্রের গভীরও যার অগম্য নয়, সেই ডুবোজাহাজটির নাম দেওয়া হয়েছে নটিলাস—তাহলে তিনি আপত্তি করার কোনো কারণ খুঁজে পেতেন না। এবং এই আত্মপ্রসাদ নিশ্চয়ই লাভ করতেন যে তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পনা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে প্রায় নব্বুই বছর পাল্লা দিতে পেরেছে।

অন্যদিকে, এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-এর "আবিষ্কার" ও "ভবিষ্যৎ-কল্পনা" অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমকালীন বিজ্ঞানের বিরোধী ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কহীন।

সাম্প্রতিক কালের সায়েন্স-ফিক্‌শনেও এই দুটি বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন মাত্রায় প্রকট। পশ্চিমী দেশের রচনায় ওয়েল্‌স্‌-ধারার প্রাবল্য চলেছে, সোভিয়েত রচনায় ভার্নে-ধারার। বলা বাহুল্য, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম আছে। তবে পশ্চিমী লেখকরা সম্প্রতি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন-ধরনের একটি অসুর-মূর্তির প্রতি অতিরিক্ত রকমের আসক্ত। এই নিরাকার নিরবয়ব অসুর-মূর্তিটি কল্পনাতীত রকমের হিংস্র ও সম্পূর্ণরূপে ন্যায়নীতি বর্জিত। সে অনায়াসে মানুষ খুন করে, মানুষ চিবিয়ে খায়, মানুষের রক্ত পান করে, মানুষকে মরণ-ঘুমে সম্মোহিত করে। এই অসুর-মূর্তির অপ্রতিহত চলাফেরায় প্রত্যেকটি মানুষ বিভীষিকাগ্রস্ত।

একই ধরনের অসুর-মূর্তির সাক্ষাৎ সোভিয়েত লেখকদের রচনাতেও পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে। সেখানে দেখা যায় মানুষের

ল্যাণে নিয়োজিত বিজ্ঞান-শক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত আসুরিক শক্তি বনমিত হচ্ছে।

আসলে প্রশ্নটা উদ্দেশ্যগত ও প্রকরণগত। কোনো একটি বৈজ্ঞানিক তিপাদ্যকে প্রমাণ করা সায়েন্স-ফিকশনের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হওয়া চিত বিজ্ঞানের আলোকে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে উদ্ভাসিত করা। ই উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অগ্রগতিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে, র একটি উপায় হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর্ব ও পর্বান্তরকে কাহিনীর ত্রে গ্রথিত করা।

বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনী সম্পর্কে এইটুকু ভূমিকা। সোভিয়েত লেখকের ল্প আলোচনা করে এই ভূমিকার সপক্ষে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করতে চাই।

আনাতোলি নিয়েপ্রোভের গল্প 'সিয়েমা'। সিয়েমা একটি ইলেকট্রনিক ম্পিউটরের নাম, বা খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলা হয় ইলেকট্রনিক গজ। ইলেকট্রনিক কম্পিউটর, সকলেই জানেন, একালের একটি আশ্চর্য বিষ্কার, যা মানুষের ভবিষ্যতকে বহুল পরিমাণে নির্ধারিত করবে।

গল্পের যিনি কথক তাঁকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে একটি ত্রির ট্রেনের কামরায় খানিকটা উদভ্রান্ত অবস্থায় ও অগোছালো সাজ-পাশাকে। একজন সহযাত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে পুরো গল্পটি ন্মাটিত। গল্পটি সম্পর্কে খানিকটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা যাক।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষার বর্ণমালা অন্তত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি অক্ষরে রাক্রান্ত। অথচ ভাষার উদ্দেশ্য যদি হয় ভাব-বিনিময় তাহলে অনায়াসেই ই ভার অনেকখানি লাঘব করা যেতে পারে। রুশভাষায় হাতিকে বলা য় 'স্লোন'—মাত্র চারটি অক্ষর। কিন্তু ইংরেজিতে বলা হয় এলিফ্যাণ্ট—টটি অক্ষর। অর্থাৎ, একই ধারণাকে প্রকাশ করার জন্যে চার থেকে টি অক্ষরের ব্যবহার। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, এক থেকে দশ—এই দশটি ংখ্যাকে চারলক্ষ বিভিন্ন বিন্যাসে সাজানো যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে দশটি াত্র অক্ষরের সাহায্যেই মানুষের যাবতীয় ধারণাকে প্রকাশ করা অসম্ভব বে কেন? কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক যে-স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে পরিবেশগত গ্‌নালকে গ্রহণ করে তা কোড্‌-সমন্বিত। এবং এই কোডের দুটি মাত্র কার—থাকা ও না-থাকা। তেমনি মানুষের ভাষাকেও পাভলভ বলেছেন কেও সিগ্‌নালিং সাম্‌টেম। একটি বস্তু বা একটি ঘটনাসঞ্জাত সিগ্‌নাল

মস্তিষ্কে যে ধারণা সৃষ্টি করে, সেই একই ধারণা সৃষ্টি হতে পারে সেই ঘটনার অসাক্ষাতে শুধুমাত্র ভাষার সাহায্যে। অর্থাৎ ভাষাও এক সিগ্‌নাল-সীস্‌টেম। অথচ, যে-স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে সিগ্‌নালকে গ্রহণ হয় তার ক্রিয়াশীলতা বৈদ্যুতিক সার্কিটের মতো। ইম্‌পাল্‌স থাকা না-থাকা—এই হচ্ছে এই সার্কিটের ভাষা। ইলেকট্রনিক কম্পি জটিল সমস্ত সমস্যার সমাধান করে এই একই ভাষার সাহায্যে—ইম থাকা এবং না-থাকা। তাহলে মানুষের মুখের ভাষাতেই বা অ অক্ষরের প্রয়োজন থাকছে কেন? দুটি মাত্র সিগ্‌নাল থাকুক— না, কিংবা, শূন্য ও এক; এই দুটি সিগ্‌নালের মাধ্যমেই যাবতীয় ভাব সম্ভব।

এমনি ভাবনাচিন্তায় আলোড়িত হতে হতেই একজন বিজ্ঞানী করেন একটি ইলেকট্রনিক কম্পিউটর, যার ক্রিয়াশীলতা বাইরের প্রো ওপরে নির্ভরশীল নয়, যা নিজের প্রোগ্রাম নিজেই সরবরাহ করতে নিজেকে নিজে থেকে সংশোধন করার ক্ষমতাও যার আছে। শুধু তা এই কম্পিউটর চাকার সাহায্যে চলাফেরা করতে পারে, লাউডস্পীক সাহায্যে কথা বলতে পারে, ধাতুনির্মিত হাতের সাহায্যে স্পর্শ করতে আলোর সাহায্যে দেখতে পারে। এই কম্পিউটরটির নাম সি বিজ্ঞানীর জীবনের সঙ্গে সে এমনভাবেই জড়িত হয়ে পড়ে যে শেষ একজন রক্তমাংসের নারী থেকে তার তফাৎ বোঝা যায় না।

কিন্তু সমস্যাটা দেখা দেয় তখনই। একদিন হুগোর লেখা 'দি মা লাফ্‌স্‌' বইটি পড়ার পরে সিয়েমা আচমকা জিজ্ঞেস করে বসে, ' আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও তো প্রেম কাকে বলে, ভয় আর যন্ত্রণাই বা বিজ্ঞানী জবাব দেয়, 'ও তুমি বুঝবে না সিয়েমা, ওগুলো পুরোপুরি মা আবেগ।'

এই কথায় সিয়েমা উদগ্র হয়ে ওঠে রক্তমাংসের মানুষটা সম্প পৃথিবীর যাবৎ জ্ঞানভাণ্ডার তার আয়ত্তে। কিন্তু মানুষের চামড়াকে করে সে বুঝতে পারল, এই স্পর্শটুকু কেমন তা সে এতদিন জানত এমনিভাবে তার কৌতূহল জাগ্রত হতে হতে শেষপর্যন্ত সে স্থির করে যে মানুষের মস্তিষ্কটাকেই সে নেড়েচেড়ে দেখবে এবং মানুষ সম্পর্কে যা জানার সমস্ত জানবে। এই উদ্দেশ্যে একটা ছুরি হাতে নিয়ে সে বিজ্ঞা

আক্রমণ করে বসে। বিজ্ঞানী শেষপর্যন্ত শর্ট-সার্কিটের সাহায্যে সিয়েমাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে অব্যাহতি পায়।

এই ঘটনাটিকেই বিজ্ঞানী ট্রেনের কামরায় সহযাত্রীর কাছে বিবৃত করে। পরে সহযাত্রীর একটি কথার সূত্র ধরে চিন্তা করতে করতে বিজ্ঞানীর উপলব্ধি হয় যে সিয়েমার নির্মাণকার্যের ত্রুটি ইন্‌হিবিশনের অভাব। অথচ পাভলভের সূত্র অনুসারে এক্সসাইটেশনের মতো ইনহিবিশনও মানুষের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতার পক্ষে অপরিহার্য। ইনহিবিশনের অভাবে স্বাভাবিক মানুষ অনায়াসেই ক্রিমিনাল হয়ে উঠতে পারে।

তখন বিজ্ঞানী স্থির করে যে সে ইনহিবিশনবিশিষ্ট নতুন এক সিয়েমা তৈরি করবে।

এই হচ্ছে গল্প। সংক্ষেপিত আকারে উপস্থিত করার ফলে গল্পের গল্পত্বটুকু এই বিবরণে হয়তো পাওয়া যাচ্ছে না—কিন্তু সম্পূর্ণ রচনাটি সত্যিকারের একটি গল্পই হয়ে উঠেছে। অথচ গল্পের পরিবেশ, আবহাওয়া ও প্রসঙ্গ-উত্থাপনের বৈচিত্র্যই এমন যে আধুনিকতম বিজ্ঞানের আশ্চর্যতম আবিষ্কারটি মানুষের ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাশীলতায় তাৎপর্যমণ্ডিত।

যে তিনটি সংকলন আমাদের হাতের কাছে রয়েছে তাতে মোট আঠারোটি গল্প। উল্লিখিত গল্পটিকে প্রতিনিধিত্বমূলক ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানাশ্রয়ী এই গল্পগুলোতে পাওয়া যাবে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের মানুষ এবং বর্তমানের ও ভবিষ্যতের বিজ্ঞান যে আশ্চর্য সম্ভাবনাময় ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং যে আশ্চর্য সম্ভাবনাময় জগতটি সৃষ্টি করবে তারই শিল্পমণ্ডিত রূপায়ন।

এই একই লেখকের আরেকটি গল্পের নাম 'দি ম্যাক্সওয়েল ইকোয়েশনস'। একটি পাল্‌স্‌-জেনারেটর ও একজন নাৎসী যুদ্ধাপরাধীকে নিয়ে এই গল্প। লেখকের ইতিহাসবোধ ও বিজ্ঞানবোধ এই গল্পে এমন একটি পরিমণ্ডল ও এমন কতকগুলো চরিত্র সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে মানুষের ভেতরকার কুৎসিতের প্রতি ধিক্কার এবং ন্যায়বোধ ও সংগ্রামচেতনার প্রতি জয়ধ্বনি প্রায় একটা ঘোষণার মতো শোনা যেতে পারে।

একাধিক গল্প রয়েছে দূর ভবিষ্যতকে নিয়ে, যেখানে নক্ষত্রলোকের কোনো গ্রহে উপস্থিত হচ্ছে এই পৃথিবীর মানুষ, সাক্ষাৎকার হচ্ছে প্রাণের অন্যতর নিদর্শের সঙ্গে। কিন্তু সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই দুই বিভিন্ন গ্রহের

অধিবাসীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী ও প্রাণক্ষয়ী সজ্ঘর্ষ শুরু হয় না, বরং গড়ে ওঠে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি। এই গল্পগুলো অন্যদিক্ থেকে একথাও সপ্রমাণ করছে যে খুন-জখম-মারামারি-কাটাকাটি ছাড়াও গল্প জমাট বাধতে পারে। এমনি একটি গল্প 'অ্যাণ্ড্রোমিডা'-খ্যাত ইভান ইয়েফ্রেমোভের 'দি হার্ট অফ দি সার্পেন্ট'।

হাতির মস্তকে মানুষের মগজ পুরে দিয়ে একটি মজার গল্প তৈরি করেছেন আলেকজাণ্ডার বেলায়েভ। গল্পটির নাম 'হয়টি-টয়টি'। এই লেখকের আরো একটি গল্প 'ওভার দি অ্যাবিস'। এই গল্পেও পরিস্থিতি কৌতুকজনক কিন্তু ভিত্তি একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

সোভিয়েট সায়েন্স-ফিক্‌শন লেখকদের এই তিনটি সংকলন পাঠ করে মনে কতকগুলো চিন্তা জাগে। কী বিচিত্র ও ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে বিজ্ঞানের গবেষণা শুরু হয়েছে, কী অসীম সম্ভাবনাময় মানুষের ভবিষ্যৎ, আর কী বিরাট ও বিপুল এই মহাবিশ্ব! কোনো লেখায় এই চিন্তা আংশিকভাবে জাগ্রত হলেও লেখাটি সার্থক। সোভিয়েত সায়েন্স-ফিকশন লেখকরা এই সার্থকতা বহুলাংশে অর্জন করেছেন।

ইতিহাসে অবশ্যম্ভাবিতা

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্ল পপারের 'দি পভার্টি অব্ হিস্টরিসিজম্' এবং 'দি ওপন্ সোসাইটি এ্যাণ্ড ইট্‌স এনিমিস্' যে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে তার প্রমাণ আইজায়া বার্লিনের শীর্ণকায় এই গ্রন্থটিতে। বার্লিন তাঁর গ্রন্থের দশম পৃষ্ঠাতেই অধ্যাপক পপারের উল্লেখে আমাদের এই প্রভাব সম্পর্কে আরও নিশ্চিত করেছেন। অবশ্যই অধ্যাপক পপার ও সার আইজায়া বার্লিন-এ তফাৎ আছে। শ্রীযুক্ত বার্লিন অধ্যাপক পপার-এর থেকে অনেক চতুর লেখক—পপার যেখানে তাঁর মত—ব্যক্তিগত মত—অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় নির্দ্বিধায় বলেন, বার্লিন সেখানে ঘুরিয়ে বলারই পক্ষপাতী। পপার সমালোচনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মতের পক্ষপাতী, এমন কি মাঝে মাঝে ভব্যতার সীমান্ত অতিক্রম করেন ('যেমন ওপন্ সোসাইটি'তে হেগেল প্রসঙ্গে), কিন্তু বার্লিন ভাবটা দেখান যেন তিনি নৈর্ব্যক্তিক এবং তাঁর আসল উদ্দেশ্য লুকিয়ে রেখে বিভিন্ন ইতিহাসপদ্ধতির চকিত উল্লেখ করেন—নিজস্ব সুবিধার্থে অনেক রাম-শ্যামকে একাকার করেন। তাঁর লেখা পড়ে মনে হয়, জাতি, ধর্ম, সভ্যতা, শ্রেণী সবই যেন এক ব্যাপার। বলাই বাহুল্য, পপার-বার্লিনের কার্য-কারণ সম্বন্ধজনিত নিয়মের অস্বীকৃতি জনপ্রিয় হয়েছে এবং এটি হালের ফ্যাশনও বটে। তার প্রমাণ বার্লিনের গ্রন্থটির* পাঁচবছরে চারটে মুদ্রণ।

প্রাথমিক ভাবে শ্রীযুক্ত বার্লিন-এর সঙ্গে মতবিরোধ হবার অবকাশ কম। কারণ তিনি কোনোরকম নিয়ন্ত্রণবাদ পছন্দ করেন না—তার বিরুদ্ধেই তাঁর এই গ্রন্থ (যা লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিকস্-এ অগস্ত কোম্‌ত-এর মেমোরিয়াল ট্রাস্টের জন্য লিখিত বক্তৃতামালা)। আপাতত এ কথাও মনে হতে পারে এই নিয়ন্ত্রণবাদের বিরোধিতা করার পথে তাঁর আক্রমণস্থল কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা মতবাদ নয়, সমগ্র নিয়ন্ত্রণবাদই এবং এক্ষেত্রে তিনি জাতি, পরিবেশ, ধর্ম, নেশন, সভ্যতা বা শ্রেণী কারুর দোহাই ক্ষমা করেন না।

*Isaiah Berlin. Historical Inevitability. Oxford Press, London.

বার্লিন-এর মতে ঐতিহাসিক চিন্তা ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের উদাহরণ ও তার সাম্প্রতিক সম্মান—এই উভয় উৎসের কাছেই নিয়ন্ত্রণবাদী মত ঋণী। তাদের শ্রেণীভাগে, সম্বন্ধপাতে, ভবিষ্যদ্বাণীতে সাফল্যলাভই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে প্যাটার্ন খোঁজায় ঐতিহাসিক বা ইতিহাসের দার্শনিকদের উৎসাহিত করেছে। ঐতিহাসিক পদ্ধতি বা হিস্টরিক্যাল প্রসেসকে ব্যক্তি প্রচেষ্টা বা ইচ্ছার স্বাধীন অতিমানবিক বা অপৌরুষেয় শক্তি প্রভাবিত ঘটনা-শৃঙ্খল হিসাবে উপস্থিত করা—এক ধরনের হেত্বাভাস। এর রূপ বিভিন্ন হতে পারে। বার্লিন ভাগ করেছেন মোটামুটি ছ-ভাগে : টেলিওলজিক্যাল, মেটাফিজিক্যাল, মেকানিষ্টিক, রিলিজিয়াস, ঈস্থেটিক, সায়ান্টিফিক। এঁরা আবার দু-ভাগে বিভক্ত। আশাবাদী (এঁরা বৈজ্ঞানিকম্মন্য, মানবিক, জ্ঞানদীপ্ত) ও নিরাশাবাদী। যাই হোক ; এঁরা কিন্তু একটা ব্যাপারে একমত "that the world has a direction and is governed by laws, and that the direction and the laws can in some degree be discovered by employing the proper techniques of investigation: and moreover that the working of these laws can only be grasped by those who realize that the lives, characters and acts of individuals both mental and physical are governed by the larger wholes to which they belong and that it is the independent evolution of these wholes that constitute the so called 'forces' in terms of whose direction truly 'scientific' (or 'philosophic') history must be formulated." (p-24)

শ্রীযুক্ত বার্লিন বলেন, এই মতবাদ ভ্রান্ত—নিয়ন্ত্রণবাদ তাঁর কাছে "no more than a sign of neurosis and confusion." প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, ভ্রান্ত কেন? যদি একটি সূত্রের অধীন এবং সুশৃঙ্খল বিবর্তনের শৃঙ্খলে মানবসমাজের সমগ্র ঘটনাবলীকে, মানবকর্ম ও মানবচিন্তাকে ন্যস্ত করতে হয়, তাহলে ঐতিহাসিককে হতে হয় সর্বজ্ঞ। বলাই বাহুল্য ঐতিহাসিক সর্বজ্ঞ হতে পারেন না ; এমন কি সমস্ত প্রাসঙ্গিক ব্যাপার তাঁর জানা থাকলেও এটা সম্ভব নয়। সুতরাং যে নিয়ন্ত্রণবাদী চিত্র আমরা ইতিহাসে গ্রহণ করি সেটা ঐতিহাসিকের মন ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এ উদ্দেশ্যমূলক সংকলন ও ব্যাখ্যারই এটা ফল। শুধু তাই নয়, আইজায়া বার্লিন

বলেন, ইতিহাসগত নিয়ন্ত্রণবাদের সাধারণ চেতনা বা কমনসেন্সের অহি নকুল সম্পর্ক। অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ সঙ্গত নিয়ন্ত্রণবাদ ইতিহাসে অচিন্ত্যনীয়। যদি আমাদের নিয়ন্ত্রণবাদকে ধরার ইচ্ছা থাকে, তাহলেও আমাদের সাধারণ জীবনের শব্দভাণ্ডার ও মানবসম্পর্ককে পাল্টাতে হবে।

নিয়ন্ত্রণবাদ অতএব ইতিহাসগত পদ্ধতি হিসাবে ব্যর্থ। কিন্তু বিপজ্জনক কেন? বার্লিন বলেন—এইভাবে ইতিহাসকে দেখলে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের ব্যাপারটা আমরা হারিয়ে ফেলি—ব্যক্তির অস্তিত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকি। এর ফলে রহস্যময় ও অদমনীয় শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ অনিবার্য। এ ব্যাপারে বার্লিন, স্পেঙ্গলার বা টয়েনবিকে নিয়ে ততটা চিন্তিত নন, যতটা বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকদের নিয়ে—কারণ এঁরা নিয়ন্ত্রণবাদের পক্ষে ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও ব্যক্তির ভূমিকা অস্বীকার করার জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেন। বার্লিন বলেন, এঁরাই 'দি কলেকটিভিস্ট স্পিরিট' 'দি মিথ অব দি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী' অথবা 'কন্টেম্পরারি কোলাপ্স অব ভ্যালু' প্রভৃতি শব্দাবলী ব্যবহার করেন।

কিন্তু, নিয়ন্ত্রণবাদ যদি এত বিপজ্জনক হয় তাহলে তার আবেদনই বা এইরকম বিস্তৃত ও গভীর কেন? এর উত্তরে বার্লিন মানব-মনস্তত্ত্বে ডুব দেন। সাতাত্তর পৃষ্ঠায় বলেন : "But principally it seems to me to spring from a desire to resign our responsibility, to cease from judging provided we be not judged ourselves and above all, are not compelled to judge ourselves—from a desire to flee for refuge to some vast amoral impersonal, monolithic whole—nature or history, or class or race or the 'harsh realities of our time' or the irresistable evolution of the social structure ....This is a mirage which has often appeared in the history of mankind, always at moments of confusion and inner weakness."

সার আইজায়া বার্লিন-এর বক্তব্য মোটামুটি এই।[১] বলাবাহুল্য আপাত

---

[১] সার বার্লিনের বক্তব্য গ্রন্থটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তাকে একত্রে আনায় পিটর গেইন-এর 'হিস্টোরিক্যাল ইনএভিটেবিলিটি' (আইজায়া বার্লিন) নামক প্রবন্ধটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

দৃষ্টিতে এই লেখার নিরপেক্ষতায় সন্দেহ করার হেতু নেই। তিনি নি
অদৃষ্টবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। (যদিও
ও অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়, উভয়ের পার্থক্য
তিনি অচেতন এবং নিয়ন্ত্রণবাদও যে আমাদের ঐতিহাসিক চিন্তার
একসময়ে একটা ভূমিকা পালন করেছিল—সেকথা সার বার্লিন
আমলেই আনেন না।) কিন্তু এই নিরপেক্ষ লেখার আসল উদ্দেশ্য,
বার্লিন-এর আসল উষ্মার কারণ, ধরা পড়ে যায় যখন তিনি
মার্কসবাদের প্রসঙ্গে আসেন। বাস্তবিক মার্কসবাদের ক্রমবর্ধমান প্র
কেন্দ্র করে জীবনোল্লাসে মাতা সার আইজায়া বার্লিনদের স্বাভাবিক
ভালোলাগার কথা নয়। তাই তাঁর চমৎকার গদ্যও বিশেষণে
হয়ে পড়ে মার্কস ও মার্কসবাদের প্রসঙ্গে এসে। "মার্কস ও মা
আরও বেশি দ্ব্যর্থক।" (পৃঃ ৮) "হেগেল ও মার্কস উভয়েই
এবং নির্বোধ মানুষের মূর্তির কল্পনা করেছেন।" (পৃঃ ২৩) "বিশে
সমষ্টি ও ইতিহাসের বিশেষ কৌশল নির্মাণের সকল প্রচেষ্টা (
মার্কসবাদীদের দ্বারা) ভেঙে পড়েছে।"—("because they proved
for they either misdescribed—over schemetiz
experience—or they were felt not to provide ans
our questions".: পৃঃ ৫২) "এদের মধ্যে মার্কসবাদ সবথেকে
সবথেকে বুদ্ধিমান, এবং ইতিহাসকে বিজ্ঞানের মতো ব্যবহার করার
ও উন্মত্ত প্রচেষ্টায় সবথেকে কম সফল।" (পৃঃ ৭১)

ওপরের এই উদ্ধৃতিসমষ্টি থেকেই বোঝা যাচ্ছে সার বার্লি
আক্রমণস্থল কী? (তিনি যে কী চতুর লেখক তা ধরা পড়ে
উদ্ধৃতিতে। এখানে যেন চরম নৈর্ব্যক্তিকতায় উদাসীনতায় আর
মতো মার্কসবাদীদেরও চকিত উল্লেখ করেন।) নিয়ন্ত্রণবাদীদের মধ্যে
নাকি সাহসিকতম, সবথেকে বুদ্ধিমান, সবথেকে ব্যর্থ, বেশি দ্ব্যর্থক
এইসব বিশেষণেই তাঁর আসল উদ্দেশ্য প্রকট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে
তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির মুখোশ। অবশ্য মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর মূল
বোধহয় জানান আট-নয় পৃষ্ঠাতে। "Marx and the Marxis
more ambiguous. We cannot be quite sure what to
of such a category as a social 'class' whose em

and struggles, victories and defeats, condition the lives of individuals, sometimes against, and most often independently of, such individuals' conscious or expressed purposes. Classes are never proclaimed to be literally independent entities: they are constituted by individuals in their interaction (mainly economic). Yet to seek to explain, or put a moral or political value on the actions of individuals by examining such individuals one by one, even to the limited extent to which such examination is possible, is considered by Marxists to be not merely impracticable and time-wasting, but absurd in a more fundamental sense—because the 'true' (or 'deeper') causes of human behaviour...lie in a pervasive inter-relationship between a vast variety of such lives with their natural and man-made environment. Men do as they do, and think as they think, largely as 'function of' the inevitable evolution of the 'class' as a whole—from which it follows that the history and development of classes can be studied independently of the biographies of their component individuals. It is the 'structure' and the 'evolution' of the class alone that (causally) matters in the end. This is, mutatis mutandis, similar to attitude taken by those who identify race with culture...." উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও, এ আলোচনায় প্রয়োজনীয়। এখানে মূল অভিযোগ এই যে মার্কস ও মার্কসবাদীরা ব্যক্তির কোনো মূল্য দেন না এবং শ্রেণীর আলোচনায় ব্যক্তির মূল্য তাঁদের কাছে নেই বললেই চলে। শ্রেণীর গঠন ও বিবর্তনই তাঁদের কাছে বড় কথা—ব্যক্তির কথা নয়। অবশ্য এই বিবর্তন, মার্কসবাদীদের কাছে নাকি, অবশ্যম্ভাবী। ("function of the inevitable evolution of the class as a whole.") বলাবাহুল্য, নতুন পদ্ধতিতে হলেও মার্কসবাদের বিপক্ষে এ এক পুরনো অভিযোগ। এবং এ অভিযোগের একমাত্র উৎস মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলী ধৈর্য ধরে পাঠের অভাব। অবশ্য আইজায়া বার্লিনের অঘটনঘটনপটিয়সী আবিষ্কারক্ষমতা

নিঃসন্দেহেই উল্লেখযোগ্য। কারণ তাঁর দৃষ্টিতে মার্কস নাকি দুঃখবাদী, স্থতরাং মার্কসের কাছে ব্যক্তির মূল্য ছিল না, এ ধরনের হাস্যকর অভিযো যে তিনি গা ভাসাবেন তাতে আর আশ্চর্য কী।

অবশ্যই এখানে আসল প্রশ্ন মার্কসবাদ নিয়ন্ত্রণবাদ কিনা। তিনি এক প্যাটার্নের মধ্যেই সব ইতিহাসকে ন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন কিনা— ইতিহাসের জটিলতাকে পরিহার করে অযথা সরলীকরণের পক্ষপাতী ছিলে কিনা।

মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন "বুর্জোয়াজির পতন ও সর্বহারাদের সমানভাবেই অবশ্যম্ভাবী।" তাহলে প্রশ্ন ওঠে বিশ্ব-ইতিহাসে বিকল্প তাহলে পাওয়া যাবে না? এ ব্যাপারে আর. পি. দত্ত-র আলোচনা স্মরণী তাঁর মতে এই অবশ্যম্ভাবিতার সঙ্গে যান্ত্রিক অদৃষ্টবাদের কোনো সম্বন্ধ নেই এই অবশ্যম্ভাবিতা: "is realised in practice through living huma wills under given social condition, consciously reacting those conditions and consciously choosing their line betwe alternative possibilities seen by them within the give conditions." এবং আমরা অবশ্যম্ভাবী ফলের কথা বলতে পারি তার কা আমাদের সামাজিক পরিবেশ বা অবস্থা (যা চৈতন্যকে নিয়ন্ত্রিত কর ও তার ক্রমবিকাশের পথ বিশ্লেষণের ক্ষমতা। আমরা বিরোধের বিক এবং শোষিত সংখ্যাধিক্যের মহত্তর বিপ্লবাত্মক চেতনা ও ইচ্ছার শক্তিসঞ্চা কথাও বলতে পারি। এমন কী এই শক্তিসঞ্চয় ও বিকাশের পথে প্রতি ব্যর্থতা, প্রতিটি ভুলপথ নির্ণয় অস্থায়ী; বিরোধমূলক অবস্থার এদের স্থা সমাধান হতে পারে না। এই বিরোধ তখন স্বাভাবিকভাবেই আরও তী সংগ্রামের দিকে নিয়ে যায়, এবং যতক্ষণ না শেষ বিজয় আসে ততক্ষণ চল থাকে। এই প্রসেস নিঃসন্দেহে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এটা পূর্বনির্ধারিত যান্ত্রিক নয়। প্রাণময়, কর্মঠ, অসহ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি প্রয়াসী মানুষের এ মানবচেতনা ইচ্ছাকৃত ভাবেই বুদ্ধি ও আবেগে নতুন বিকল্প পথ, নতুন জগতে অনুসন্ধানী। এবং: "This fighting revolutionary consciousnes is by no means a bowing to an inevitable outcome, but

১ পিটের গেইনের মতো সার বার্লিনের গুণগ্রাহীকেও এখানে প্রতিবাদ করতে হয়েছে।

most actively a seeking to tip the balance and make certain by action the victory of one alternative and the defeat of another alternative."[১] স্থতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে আইজায়া বার্লিন কথিত নিয়ন্ত্রণবাদীদের অবশ্যম্ভাবিতা থেকে এর তফাৎ আসমান-জমিন। তাঁর গ্রন্থের আট-নয় পৃষ্ঠাতে যে মার্কসবাদের পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গেই বা এর মিল কই? এখানে কী ব্যক্তির ওপর, তার ইচ্ছা, বুদ্ধি, আবেগের ওপর জোর দেওয়া হয় নি?

অবশ্য এ ব্যাপারে মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা থেকেই উদ্ধৃতি নেওয়া ভালো। ব্লককে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস বলেছেন: "According to the materialistic conception of history, the ultimately determining element in history is the production and reproduction of real life. More than—neither Marx nor I have ever asserted hence if somebody twists into saying that the economic element is the only determining one, he transforms that proposition into a meaningless, abstract, senseless phrase. The economic situation is the basis, but the various elements of the superstructure—political forms of the class struggle and its results, to wit: constitutions established by the victorious class after a successful battle etc., juridical forms, and even the reflexes of all these actual struggles in the brain of the participants, political juristic philosophical theorics religious views and their further development into system of dogmas—also exercise their influence—also exercise their influence upon the course of the historical struggles and in many cases preponderate in determining their form." (স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মার্কসবাদ কোনোক্রমেই ইকনমিক ডিটারমিনিজম-এর স্বগোত্রীয় নয়)। স্টার্কএনবুর্গকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস ফের জানালেন: "Men make their history themselves, but not as yet with a collective will or according

১ আর. পি. দত্ত-র মতটি নীডহাম-এর 'ইন্টিগ্রেটিভ লেভেলস' নামক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

to a collective plan or even in a definitely defined,
society. Their efforts clash, and for that very reason all
societies are governed by necessity, which is suppleme
by and appears under the forms of accidents." এঙ্গেলস
লেখা চিঠিতে মার্কস বলেন: "The social history of men is n
anything but the history of their individual develop
whether they were conscious of it or not." আরও
"the productive forces are...the result of practical hu
energy." 'দি জার্মান ইডিয়লজি'তে পাই: "the first premise o
human history is of course, the existence of living hu
individuals."

এই স্বল্পসংখ্যক উদ্ধৃতিতেই প্রকাশ মার্কসবাদের সঙ্গে ক্লাস-ডিটারমিনি
এরও কোনো সম্পর্ক নেই। আইজায়া বার্লিন-এর আট-নয় পৃষ্ঠার মূল
ভিত্তিহীন। ব্যক্তিগত দায়িত্ব, ইচ্ছা, বুদ্ধি, ব্যক্তির প্রশ্ন সবই মার্কস-এর বি
স্থান পেয়েছে। আর সাম্প্রতিক রাশিয়ার ঘটনাবলীতেও প্রকাশ
কর্মের জন্য ব্যক্তিকেই দোষারোপ করা যায়, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের
ঘটে শ্রেণীহীন সমাজে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নয়। সবচেয়ে বড় কথা, আ
গ্রাম্‌চির রচনা পাঠ করার পর আইজায়া বার্লিন-দের মার্কসবাদকে
করার করুণ প্রয়াসকে আরও হাস্যকর ঠেকে।

অবশ্য পশ্চিম ইওরোপ-আমেরিকার সামগ্রিক সঙ্কটের পটেই আ
বার্লিন-এর লেখা পাঠ্য। কারণ ইতিহাসে যথেচ্ছাচার এই সঙ্কটেই
এঁদের লেখা পড়ে এঙ্গেলস-এর সাবধানবাণী বার বার মনে পড়ে: "I w
furthermore ask you study this theory from its orig
sources and not at second hand ; it is really much easeir."

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

ভবতোষ দত্ত

১২৯২ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার সংকলন প্রকাশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবির বিস্তীর্ণ জীবনী ও কাব্যসমালোচনা লেখেন। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র বহু তথ্য সংগ্রহ করে বাংলাসাহিত্যের উৎসাহী পাঠকদের উপহার দেন। আজ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সংগৃহীত এই তথ্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'কবিচরিত' নামে যে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসজাতীয় বই প্রথম প্রকাশ করেন, তাতে ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গভাষার লেখক' নামে বিখ্যাত বইতে বাঙালি লেখকদের বিবরণ বের করেন। তাতে মূলত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপরেই নির্ভর করেছিলেন। পরবর্তী কালে যাঁরাই ঈশ্বর গুপ্তের সম্বন্ধে লিখতে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের দেওয়া তথ্যই ব্যবহার করেছেন। নতুন কোনো অনুসন্ধান বিশেষ হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন "এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি।" বঙ্কিমচন্দ্র 'সংবাদপ্রভাকর'-এর দীর্ঘ ইতিহাস দিয়েছিলেন; সেই প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, 'সংবাদপ্রভাকর'-এর সম্পাদক হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বের এই বিচার বাঙালি সমালোচকদের দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট করে নি। গুপ্তকবি সম্পর্কে যে ধারণা বর্তমানে সুপ্রচলিত তা হচ্ছে এই যে তিনি রক্ষণশীল মনোভাবের কবি ছিলেন, আধুনিক জীবনকে তিনি ব্যঙ্গ করতে ভালোবাসতেন। তাঁর কবিতা অশ্লীলতা-দোষ থেকে একেবারে মুক্ত নয়। গুপ্তকবি সম্পর্কে এই ধারণার কারণ খুব সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই। বঙ্কিম ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্বের অতি চমৎকার সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর সম্পাদকীয় মতামতের

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (প্রথম খণ্ড)। বিনয় ঘোষ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। সাড়ে বারো টাকা।

আলোচনা করেন নি। বঙ্কিমের এই সমালোচনা কবি হিসাবে ঈশ্বর পরবর্তী পাঠকদের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, কিন্তু গদ্যলেখক ঈশ্বর পরে প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন। 'সংবাদপ্রভাকর' সেকালের বাঙালি গঠনে যে গুরুভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সে কথা পরে আর বিচার্য এর একটা প্রধান কারণ অবশ্যই এই যে, ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যরচনা মুদ্রিত হয় নি।

ইদানীং বাঙালি গবেষকদের দৃষ্টি এদিকে পড়েছে। কিছুকাল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণের নানা দিক নিয়ে গবেষণা হয়েছে। সেকালের সংবাদপত্রগুলিতে এর অজস্র উপকরণ ছড়িয়ে স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপরিচিত সংকলন এ বিষয়ে পথপ্র করেছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ সংকলন করেছিলেন খ্রীষ্টান মিশনারি-পরিচা 'সমাচারদর্পণ' পত্রিকা থেকে। সংবাদসংগ্রহের উৎস হিসাবে 'সমাচার অমূল্য হলেও এর থেকে দেশীয় মনোভাব জানা সম্ভব ছিল না। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর মূল্য যে এই কারণে খুব বেশি তা অস্বীকার করবার উপায় সেকালের নবযুগ-অভ্যুদয়ের ফলে যে সব চমকপ্রদ ঘটনা ঘটছিল, তার সংবাদ জানার দরকার আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে সাধারণ বা সমাজ সেই পরিবর্তনকে কী চোখে দেখছে, তা জানার। কারণ এর পরবর্তী কালে সুদূরপ্রসারী হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন :

> "এখন হইতে প্রভাকর উদীয়মান রবির ন্যায় দিন দিন শ্রী সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রভাকরের কবিতা পড়িবার বাংলাদেশের লোক পাগল হইয়া উঠিল। প্রভাকর বাহির বিক্রেতৃগণ রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া ঐ সকল কবিতা পাঠ করিত দেখিতে দেখিতে কত কাগজ বিক্রয় হইয়া যাইত।"

শিবনাথ প্রভাকরের জনপ্রিয়তার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন কবিতাকে। কিন্তু এমন অনুমান যদি করি যে এই জনপ্রিয়তার পরোক্ষ ফল ছিল ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদকীয় মতামতের বিস্তার এবং বা মনোভাব গঠন তবে তার জন্যে আলাদা প্রমাণ দেবার দরকার রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো ঈশ্বর গুপ্ত অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী না, তাঁর কোনো মত নবযুগ-গঠনে মৌলিক প্রভাব বিস্তার করে এমন কথাও বলা যায় না। তবু আমাদের মনে হয়, সম্পাদক

গুপ্তের মত সেকালের সাধারণ বাঙালির চিন্তাকেই প্রতিফলিত করেছে। বিশেষত বঙ্কিমের ওই উক্তিটি বিশেষভাবেই স্মরণীয় :

> "সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য ; নানা স্কুলকমিটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন—আবার ওদিকে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিতেন।"

এটাই স্বাভাবিক। যদিও প্রাচীনের প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বভাবগত, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত এদের মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র ছিলেন। সেকালে ছিলেন যাঁরা ভাবনেতা তিনি তাঁদের সঙ্গে যেমন যোগ রক্ষা করে চলেছেন, তেমনি সাধারণ জনসমাজে তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ। তাই তিনি যেমন উচ্চতর চিন্তাকে গ্রহণ করে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তেমনি চিন্তার আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তিনি জনসমাজ থেকে আলাদা হয়ে থাকেন নি। ঈশ্বর গুপ্তের এই বিশেষ সুবিধা সেকালের আর কারোই ছিল না। এ কথা বলা কি অনুচিত হবে, ঈশ্বর গুপ্তের মতো ব্যক্তিই নবজাগরণের আদর্শ প্রচারে সর্বাধিক সহায়তা করেছিলেন। বাংলার জাগরণ সেকালের উচ্চতর নেতাদের মধ্যে যে উল্লাস সৃষ্টি করেছিল, কয়েক বছরের মধ্যে সেটা পরিণত হলো হরিষে-বিষাদে। রামমোহন-দ্বারকানাথ-বিদ্যাসাগর—কেউ কি ভেবেছিলেন নবজাগরণ আসবে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের মধ্যে আর দেশের বিপুল জনসাধারণ থাকবে বঞ্চিত? নবজাগরণের বাণীকে ছড়াবার উপায় কী ছিল? এক ছিল শিক্ষা, আর ছিল সাময়িকপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত যে বাংলা শিক্ষার জন্যে এত ব্যস্ততা প্রকাশ করেছিলেন, সে কি শুধু রক্ষণশীলতার জন্যে? এমন কি অভিপ্রায় তাঁর ছিল না যে নবজাগরণের ভাবসম্পদ ছড়িয়ে পড়ুক তাদের মধ্যে যারা ইংরেজি জানে না? জনসংযোগ ঘটাবার জন্যে ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা আমরা যদি আজ স্মরণ না করি, তবে আমাদের কৃতঘ্নতার পাপ স্পর্শ করবে মাত্র। এই জনসংযোগের অভাবে বাংলার জাগরণ যে সম্পূর্ণ হয় নি, এ কথা আজ আমরা সাধারণ মানুষরাই ভাবছি তা নয়, এ কথা গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য মনীষী ব্যক্তিরা।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকা থেকে সংবাদ ও মন্তব্যের যে বৃহৎ সংকলন প্রকাশ করেছেন, তার থেকে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া তো গেলই, ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্বের এই নতুন রূপ

দেখতে পাওয়া গেল। তাঁর কবিতা পড়ে রক্ষণশীল বলে তাঁকে ঠেলে সে
রেখেছিলাম, তাঁর গদ্য 'ভয়াবহ' বলে পড়বার উৎসাহ প্রকাশ করি নি। বি
ঈশ্বর গুপ্তের বিপুল গদ্য রচনা পরীক্ষা করে প্রত্যাশাতীত ফল লাভ হবে
ইতিপূর্বে গুপ্ত কবি রচিত কবিওয়ালাদের জীবনী সংগৃহীত হয়ে প্রকাশি
হয়েছে। তখন থেকেই এমন সন্দেহ হচ্ছিল—"he is more sinned again
than sinning." গভীর সুরে গভীর কথা তিনি বলতে পারেন নি, কবিত
তাই তিনি নিজের কথাই ঠাট্টা করে উড়িয়েছেন। আমরা সেই ঈশ
গুপ্তকেই মনে রেখেছি—অবশ্য তাঁর পদ্যের শক্তির জন্যই—কিন্তু গভীর ক
গভীর সুরেই যে ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন আমরা তার সন্ধান রাখি নি। গদ্য রচনা
তিনি সত্য সত্যই দেশের, জাতির এবং যুগের ভাবনা প্রকাশ করে গিয়েছেন

ঈশ্বর গুপ্তের ভাবনা 'সমাচারচন্দ্রিকা' ও ধর্মসভার সম্পাদক ভবানীচর
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে গুপ্ত কবির গ
রচনায়। পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁকে সেকালের নানা গুরুতর বিষ
মন্তব্য করতে হয়েছিল। বিনয়বাবু এদের ভাগ করেছেন অর্থনীতি, সমা
শিক্ষা ও বিবিধ বিভাগে। এই কয়ভাগে সত্য সত্যই ১৮৩১ থেকে ঈশ
গুপ্তেরও মৃত্যুর পরবর্তীকালে বাংলার সমাজচিত্রের বর্ণাঢ্য বিবরণ পাও
যাচ্ছে। সকলেই জানেন এই সময়টাই আসলে বাংলাদেশের একটা অত্যন্ত গু
সন্ধিক্ষণ। নূতন ভাবের প্রবেশ এবং পুরাতনের অনিচ্ছুক প্রস্থানের দ্বিধায়
এই যুগটি আবিষ্ট। এ সময় একটা সুস্পষ্ট নীতিকে মেনে চলা সত্যই অত্য
কঠিন ছিল। যারা প্রাচীনকে অবলম্বন করেছিল পরবর্তী কালে তারা ভ্রা
বলে প্রমাণিত হয়েছে, আবার যারা নবীনের লালসায় প্রমত্ত হয়েছিল তার
অভ্রান্ত বলে গ্রাহ্য হয় নি। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের মতো সাধারণ-শিক্ষিত
মানুষ পল্লীপরিবেশেই প্রধানত মানুষ হয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে মানসিক দ্বি
অবশ্যই ক্ষমার্হ। তিনি যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন এটাই বরং তাঁর সবচেয়ে
বড় কৃতিত্ব বলে মনে করি। অবশ্য সম্পাদক জীবনের প্রথমে তিনি গোঁ
রক্ষণশীল ছিলেন তার প্রমাণ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৮৩
খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' পাওয়া যায় না বলে কোনো প্রত্য
প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হয় না। পরোক্ষ সূত্রে প্রাপ্ত প্রমাণে দেখা যায় হি
কলেজের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেছিলেন বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁ
বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তার কিছু বিবরণ হি

কলেজের পুরনো নথিপত্রে দেওয়া আছে। বিনয়বাবু এ সব উদ্ধৃত করেছেন। যার পৃষ্ঠপোষকতায় ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন সেই যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের খুল্লতাত চন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন হিন্দুকলেজের গভর্নর। অনুমান করি যোগেন্দ্রমোহনের নেপথ্য অনুরোধে চন্দ্রমোহনের মধ্যস্থতায় এই বিবাদ মিটে যায়। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের রক্ষণশীলতার সবচেয়ে ভালো প্রমাণ পাওয়া যায় বিদেশী-পরিচালিত পত্রিকার মন্তব্যে। ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনীর অবতরণিকায় বর্তমান লেখক তা উদ্ধৃত করেছেন।

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের রক্ষণশীল মনোভাব বেশিদিন থাকে নি। বিনয়বাবু লক্ষ্য করেছেন ১৮৪০ থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যেতে থাকে। অবশ্য আমার অনুমান তাঁর পরিবর্তন ঘটতে থাকে ১৮৩৮ থেকেই। অতঃপর বিনয়বাবু ঈশ্বর গুপ্তের উদার মনোভাবের প্রচুর প্রমাণ দেখিয়েছেন। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাই এ বিষয়ে আমাদের সাক্ষী। যন্ত্রবিদ্যার অনুশীলনে গুপ্তকবির উৎসাহ, ধর্মসভার প্রতি বিরাগ, জাতির ভিত্তিতে বৃত্তি নির্ধারণের অনাবশ্যকতাবোধ, কৃষক ও জনসাধারণের প্রতি গভীর সহানুভূতি, মধ্যপন্থী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি—ইত্যাদি নানা দিক দিয়ে গুপ্তকবির বৈশিষ্ট্য সেকালের পক্ষে অনন্যসাধারণ এবং ইতিহাসের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ। বিনয়বাবু বলেছেন :

> "নিজের সচেতন বুদ্ধি ও একাগ্রতা দিয়ে তিনি এই সমাজ থেকে তাঁর আত্মোৎকর্ষের উপাদান উন্মুখ হয়ে সংগ্রহ করেছিলেন। তাই তাঁর কবিয়ালী মন যুক্তিপ্রধান যুগে ক্রমে অনেকটা যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিল।"

আমাদের ধারণা এই গ্রন্থটি ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার নিরসন করবে। গদ্যরচনা ও পদ্যরচনা মিলিয়ে কবিকে নতুন করে বিচার করে দেখার আবশ্যকতা অনুভূত হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়াও আধুনিক বাংলার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগের বাঙালি মন ও সমাজবিপ্লবের অত্যন্ত মূল্যবান উপকরণ বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পেল। গ্রন্থকার পুস্তক সম্পাদনে স্বর্গীয় ব্রজেনবাবুর পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। পিছনে 'প্রাসঙ্গিক তথ্য' অংশে মূল গ্রন্থে অবতারিত প্রধান প্রধান সামাজিক সাংস্কৃতিক ঘটনার বিস্তৃত টীকা ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হওয়ায় গবেষকদের কাছে গ্রন্থটির ব্যবহার্যতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত গবেষণার পথ প্রশস্ত করছে। সেকালের অন্যান্য ছয়টি পত্রিকার আরও চারটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হবে। এর চেয়ে শুভ সংবাদ আমাদের পক্ষে আর কি হতে পারে ?

সংস্কৃতির সংজ্ঞা*

নৃপেন গোস্বামী

বাংলাদেশের আচার্যস্থানীয় বিশ্ববিশ্রুত ভাষাবিদ্‌ স্নীতিকুমার চট্টোপা
সংস্কৃতি সংক্রান্ত ধারণাকে সর্বপ্রথম জনসাধারণের মধ্যে চালু করে
একথা বোধহয় অনেকে বিস্মৃত হয়েছেন। ইংরেজি cultur
কালচার-এর, জার্মান kultur-এর, কুলতুর-এর অর্থবাচক বাংলা শব্দের
চলছিল এক সময়ে এবং শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন
আনুকূল্যে 'সংস্কৃতি' শব্দটি অনুমোদিত হয়। ইতিপূর্বে মারাঠী
কালচার-এর অর্থে সংস্কৃতি শব্দের প্রচলন হয়েছিল। প্রস্তাবিত কৃষ্টি
দাবি জোরালো হয় নি, কেননা হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর ব্যাখ্যা অনুসারে 'ঋগ
কৃষ্টি হচ্ছে কৃষিরত গোষ্ঠীর বাচক। অপরপক্ষে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এ
সংস্কৃতি শব্দের একমাত্র সম্ভাব্য তাৎপর্য হচ্ছে কালচার। এই শ
নির্বাচনে শুধু নয়, এর উপর নতুনতর অর্থ সংযোজনে, নতুনতর আলোক
স্নীতিবাবুই অগ্রণী হয়েছিলেন, সেজন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভা
অন্ধ দেশপ্রীতি জাতীয়সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ উন্মোচনে অক্ষম, আ
বিপরীত দিক দিয়ে দেশজ সংস্কৃতির প্রাপ্য মুল্য স্বীকারে কুণ্ঠা ও
সমসাময়িক কালের একটা দুর্বলতা। সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণে নির
ভাবাবেগবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর ফলপ্রসবী হতে পারে। মহা
স্নীতিকুমার নিরুচ্ছ্বাস মননে পথিকৃৎ-এর কাজ করেছেন এবং
চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন নীহাররঞ্জন রায়, গোপাল হা
প্রভৃতি সংস্কৃতিবাদীরা। বিগত একশত বছরে ইওরোপ ও আমেরিকা
ধারণা মানব সম্বন্ধীয় গবেষণায় বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। এ
Society বা সমাজের ধারণা, অপরটি সংস্কৃতির ধারণা। সমাজের ধার
প্রাধান্য দিয়েছেন কার্ল মার্কস, ডারখেইম (Durkheim), মর্গান, স্পে

---

*সাংস্কৃতিকী। স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাক্‌-সাহিত্য। সাড়ে পাঁচ টাকা।

প্রভৃতি। সংস্কৃতির ধারণার পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন টাইলর, র‍্যাটজেল (Ratzel), ইলিয়ট স্মিথ, উইসলার (Wissler) প্রভৃতি। বাংলাদেশে মার্কসবাদীরা সমাজের ধারণার উপর পক্ষপাত দেখিয়েছেন, তাঁদের ভিতরে দু-একজন অবশ্য সংস্কৃতিবাদীও রয়েছেন। Sociologism বা সমাজবাদ এবং Culturologism বা সংস্কৃতিবাদ-এর দুইটি ধারা পশ্চিমী জগৎ থেকে ভারতে সঞ্চারিত হয়েছে। শেষোক্ত ধারার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেছেন স্নীতিকুমার। তাঁকে আমরা সংস্কৃতিবাদী রূপে গণ্য করতে পারি।

তাঁর সাম্প্রতিক কালের গ্রন্থ 'সাংস্কৃতিকী', প্রথম খণ্ড, সংস্কৃতি-সমালোচনার ক্ষেত্রে অভিনব অবদান। এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কতিপয় পূর্বপ্রকাশিত উপকরণবহুল চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ। যথা—'সংস্কৃতি', 'যবদ্বীপের মহাভারত', 'রামায়ণ', 'কুরল্‌', 'কোলজাতির সংস্কৃতি', 'তাও', 'সুফী অনুভূতি ও দর্শন', 'অল্‌-বীরুণী ও সংস্কৃত', 'দরাপ খাঁ গাজী', 'মণিপুর-পুরাণ', 'শিল্প-কলা' এবং রবীন্দ্রনাথের '"জীবন-দেবতা"'। বিষয়বস্তুর ভিন্নতা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে একটি সামগ্রিক সুর প্রবাহিত, অর্থাৎ, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহিঃপ্রভাব বা diffusion-এর প্রতিপাদন। সংস্কৃতির দেশিক ও কালিক অবস্থিতি স্বীকার্য হলেও অনতিক্রম্য নয়। এক দেশ থেকে অপর দেশে, এক যুগ থেকে অপর যুগে সংস্কৃতির পরিক্রমণ বাধা ও ব্যবধান অতিক্রম করে। প্রথম ব্যাপারটি নৃবিজ্ঞানে diffusion বা বিকিরণ রূপে কথিত হয়ে থাকে, দ্বিতীয় ব্যাপারটি নিরূপিত হয় tradition বা জনশ্রুতিরূপে। এই দুই ব্যাপারের দ্বারা সংস্কৃতির রূপ নির্ণীত হয়। স্নীতিবাবুর প্রবণতা প্রথম ব্যাপারটিকে উদ্‌ঘাটনের দিকে। টাইলর জোর দিয়েছেন দ্বিতীয় ব্যাপারটির উপর, কেননা তিনি বিবর্তনবাদী। স্নীতিবাবু আত্মঘোষিত বিকিরণবাদী না হলেও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বহিঃপ্রভাবের দৃষ্টান্ত সংগ্রহে বরাবর উৎসাহী।

স্নীতিকুমার সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংজ্ঞাকরণে চেষ্টিত হয়েছেন। তাঁর মতে মানবজীবনের বহিরঙ্গ বস্তুগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয় সভ্যতার মান, আর অন্তরঙ্গ বস্তুগুলি সংস্কৃতিকে নিরূপিত করে। "একাধারে সভ্যতা-তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তর প্রাণ বা মানসিক অনুপ্রেরণা যা, তাই হচ্ছে culture।" লাতীন col, কোল্‌ ধাতুর অর্থ চাষ করা, আবার যত্ন করাও হয়। এই কোল্‌ধাতু থেকে এসেছে লাতীনের cultura, কুলতুরা

শব্দ, আধুনিক culture-এর, কালচার-এর জনক পদ। (পৃঃ
'সাংস্কৃতিকী')

ইংরেজি civilisation-এর, সিভিলিজেসন-এর মূলে রয়েছে নগর
লাতীন civis, সিভিস পদটি। এর বাংলা প্রতিশব্দরূপে সভ্যতা
প্রচলিত হয়েছে। সভা, অর্থাৎ মানবগণের একত্রীভবন থেকে উৎ
হয়েছে সভ্যতা পদের। সভ্যতাকে সুনীতিবাবু মুখ্যত নগরের ব্যাপার
বিবেচনা করেছেন। (পৃঃ ৯)

সভ্যতার এই সংজ্ঞাকরণ মর্গান ও গর্ডন চাইলড-এর অভিমতের
মিলবে না। এঁরা লিপিজ্ঞানকে সভ্যতার মাপকাঠি রূপে ধার্য করে
সভ্যতা যদি নগরের ব্যাপার হয় তাহলে 'ঋগ্বেদ'-এর মতো সাহিত্য-সৃজন
গ্রাম্য জনগোষ্ঠীর সভ্যতা অস্বীকৃত হয়।

ম্যাকিবার এবং পেজ-এর বিবেচনায় "Culture is the antith
of civilization", অর্থাৎ, সংস্কৃতি হচ্ছে সভ্যতার বিপরীত ধা
সভ্যতার উৎপত্তি জীবনের প্রয়োজন থেকে, বাহ্য অবস্থা নিয়ন্ত্রণের
থেকে। সংস্কৃতি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের বহিঃপ্রকাশ। সভ
স্থূল লক্ষ্য প্রতিভাত, যথা, টেক্‌নলজী বা বাস্তব উপকরণ। সংস্কৃ
পরিচায়ক শিল্পমূল্য, দর্শন, ধর্ম, মন্দির, অর্থাৎ মানুষের মানসিক ও নৈ
উপার্জনসমূহ। বিশেষ দুর্বিপাক না ঘটলে সভ্যতার অগ্রগতি অব্য
থাকে, যথা, জীবনযাপনের উপকরণ স্বয়ংচালিত যানের ক্রমিক বিব
সংস্কৃতির ব্যাপারে উন্নতি মানসিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল, সুতরাং নি
নয়। সভ্যতার উপকরণ সহজে ধার করা চলে, যথা, বন্য অব
মানুষের রাইফেল-চালনা। কিন্তু সাংস্কৃতিক ঋণ বিকৃতিপ্রাপ্ত
[pp. 498-503, 'Society', 1959]

মোটামুটিভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই পৃথকীকরণ সুনীতিবাবুর বক্ত
অনুকূল।

পুরাতাত্ত্বিক মহলে কালচার বা সংস্কৃতি বাহ্য উপকরণের জো
আবার, নৃতাত্ত্বিক বিচারে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি অতি ব্যাপক সংজ্ঞা।
ভিতরে মানবীয় যাবতীয় বিশ্বাস ও আচরণগত ব্যাপার, সর্বপ্রকার বা
উপকরণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সুনীতিবাবু সংস্কৃতিকে বিশেষ তাৎপর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির সূত্র হিসেবে তিনি কয়েকটি প্রবণতাকে মুখ্যভাবে বিবেচনা করবার পক্ষপাতী। যথা, সমন্বয়, তত্ত্বানুসন্ধিৎসা, অহিংসা, দম বা আত্মদমন, ত্যাগ বা শাশ্বত সত্তার দিকে দৃষ্টি রেখে নশ্বর বস্তুজগতের প্রতি উপেক্ষা ইত্যাদি। (পৃঃ ১০-১২)

ভারতীয় সমন্বয়-প্রবৃত্তি বা বহিঃপ্রভাব আত্মসাৎ করণের দিকে মানসিক ঝোঁকের দরুণ ধর্মবিশ্বাসে বহুপ্রকার জটিলতা দেখা দিয়েছে, নিত্য নতুন দেব-দেবতার, গ্রাম্য ও লৌকিক দেবতার আমদানি ঘটেছে, পূজা-চর্যায় বিবিধ উপকরণের সমাবেশ সমর্থিত হয়েছে। বহু দেববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নূতনের গ্রহণ হয় সহজতর এবং পরমত-সহিষ্ণুতা স্বাভাবিকভাবে প্রকট হতে থাকে। এক দেববাদের মৌলিক অনুপ্রেরণা একটিমাত্র চিন্তা কেন্দ্রে নিবদ্ধ থাকে, তাই বহিঃপ্রভাব-ভীতি কখনও শিথিল হতে পারে না।

ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইহলোকের প্রতি বিমুখ এবং পরলোক সম্বন্ধে সদা-সচেতন—এই মত প্রকাশ করেছেন অনেকে। ক্রোয়েবারের মতে সংস্কৃতির দুটি দিক হচ্ছে বিচার্য—eidos, এইডোস বা আকারের দিক এবং ethos, এথোস বা মানসিক প্রবণতার দিক। তিনি বলেছেন যে চীনা প্রবণতা ইহলোকমুখীন, পরন্তু ভারতীয় প্রবণতা পরলোকের প্রতি নিবদ্ধ। এইরূপ ধারণার সমর্থনে নজির-রূপে গণ্য হতে পারে 'উপনিষৎ'-এর তত্ত্ব, ভারতীয় দর্শনের মোক্ষ-বাদ, তন্ত্রের মৌলিক ভাবাদর্শ। কিন্তু এর বিপক্ষে নজির অপ্রতুল নয়। ভারতীয় জীবনাদর্শে চতুর্বর্গ, অর্থাৎ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, সমমর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। 'কাম-সূত্র' ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', এমন কি 'মনুসংহিতা' বা 'ধর্মশাস্ত্র'—ভারতীয় ঐহিকতাকে নিতান্ত স্থূলভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে। যতি-মুনি-ভিক্ষু-শ্রমণের জীবন-চর্যা কোনোকালেই জনগণের আচরণীয় ছিল না। সাধারণ মানুষের পূজা-চর্যায় বৈদিক যজ্ঞীয় ঐহিক লাভালাভের বিচার বরাবর হয়েছে পরিস্ফুট। পূজার বহির্ভূত শান্তি-নামধেয় কর্ম-সমূহ, যাদু-জাতীয় অভিচার-সমূহ নগ্ন ঐহিকতার সাক্ষ্য-রূপে বরাবর অনুমোদিত হয়েছে গ্রাম্য ও নাগরিক জীবন-যাত্রায়। [pp. 293-294, 'Anthropology'.]

ভারতীয় পারলৌকিক প্রবণতাকে অবশ্য সুনীতিবাবু প্রকল্প-রূপে উপস্থাপিত করেন নি ক্রোয়েবারের মতো।

ভারতীয় অধিবাসীগণের মধ্যে নৃবংশীয় ধারার বিচারে সুনীতিবাবু

বিরজাশঙ্কর গুহের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছেন। তিনি একাধিক প্র প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন যে :

(ক) আদি-অস্ট্রেলীয় নিষাদ-রূপে বর্ণিত অস্ট্রিক-ভাষী জন-গোষ্ঠী ভা গ্রাম্য সভ্যতা গড়ে তোলে ;

(খ) 'ঋগ্বেদ'-এ দাস ও দস্যুরূপে বর্ণিত দ্রাবিড়-ভাষী ভূমধ্য সাগ জন-গোষ্ঠী নাগরিক সভ্যতার পত্তন করে এবং এরাই সম্ভবত সিন্ধু উপত্য নাগরিক সভ্যতারও স্রষ্টা ;

(গ) নর্ডিক বা উদীচ্য আর্যভাষী যাযাবর জন-গোষ্ঠী বৈদিক সাহি সৃষ্টি করেছে এবং দ্রাবিড়দের দেখাদেখি নগর নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছে।

সুনীতিবাবুর বিবেচনায় ঋগ্বেদীয় "দাস" জাতি-বাচক নাম হতে পা যদিও পরবর্তীকালে এই শব্দের অর্থ হয়েছে গোলাম। অনুরূপ নজির র গোলাম-বোধক slave, শ্লেভ-শব্দের মধ্যে। এর আদিরূপটি ছিল sla শ্লাভ—একটি জাতির নাম। ঋগ্বেদীয় আর্যেরা যে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছিলে তারা সম্ভবত দ্রাবিড়-গোষ্ঠী এবং তারাই দাস-রূপে অভিহিত হয়েছে।

'ঋগ্বেদ'-এ উল্লিখিত দাসরা এবং হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টা জন-গোষ্ঠী ইদানী অভিন্ন-রূপে বিবেচিত হচ্ছেন। এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষগুলিতে প্রা নৃবংশীয় উপকরণে আদি-অস্ট্রেলীয়, ভূমধ্য সাগরীয় এবং অ্যালপাইন এ তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে ভূমধ্য সাগরীয় নৃবংশে উপর জোর দেওয়ার যুক্তি অচল হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও দ্রাবিড় সংক্রা প্রকল্প খুব সম্ভাবনামূলক নয়, কেন না দ্রাবিড়কে ভূমধ্য সাগরীয় নৃবংশে স্থাপন সকলের দ্বারা সমর্থিত হয় নি।

শশাঙ্কশেখর সরকার দ্রাবিড় গোষ্ঠীতে বেদ্দিদ প্রবণতা অনুমান করেছেন বেদ্দিদরা যদি ভারতের প্রকৃত আদিবাসী হন, সেক্ষেত্রে বহিরাগত গোষ্ঠী-রূ দ্রাবিড়েরা বিবেচিত হতে পারেন কিনা ভেবে দেখবার বিষয়।

নর্ডিক নৃবংশ ও বৈদিক আর্যের সমীকরণ-মূলক প্রকল্প বিষয়েও এখন পর্যন্ত মতৈক্য দেখা যায় নি।

এস্থলে কোলদের বোঙ্গা-বিশ্বাস সম্পর্কে সুনীতিবাবু-কর্তৃক গৃহীত ব্যাখ্যা এবং আর একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। এই আদি-অস্ট্রেলীয় বিশ্বাসকে Animism বা আত্মাবাদ-রূপে ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছে, যার পক্ষে সুনীতিবাবু সমর্থন জানিয়েছেন। বোঙ্গারা হচ্ছে দৈবশক্তি বা আত্মা; তারা পর্বত,

নদী, বৃক্ষ, ব্যাঘ্রাদি জন্তুতে অবস্থিত। তাদের সবার মূলীভূত এক শক্তি আছেন সিঞ্ বোঙ্গা, যাঁকে সাঁওতালেরা ঠাকুর বাবা-রূপেও অভিহিত করে। আক্ষরিক অর্থে সিঞ্ হচ্ছে সূর্য। সুতরাং সিঞ্ বোঙ্গা হচ্ছেন সূর্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে বোঙ্গাবাদ (Bongaism) হচ্ছে ম্যানা-বিশ্বাসের সমতুল। মেলানেসিয়া অঞ্চলে mana, ম্যানা সংক্রান্ত বিশ্বাস দৃষ্ট হয়। ম্যানা হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক অপ্রাকৃত শক্তি এবং প্রাণবন্ত ও প্রাণহীন উভয়বিধ বস্তুতে অধিষ্ঠিত। বোঙ্গার অধিষ্ঠানেও জড় বস্তু ও প্রাণীর কোনো তফাৎ নেই। সুতরাং বোঙ্গা নৈর্ব্যক্তিক শক্তিরূপে প্রতীয়মান। সিঞ্ বোঙ্গার আধার সূর্য, কিন্তু দ্যোতিত অর্থ দেবতা নয়, নৈর্ব্যক্তিক শক্তিমাত্র।

দু-টি ব্যাখ্যাই সম্ভবত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমীচীনতার দাবি করতে পারে। কোনো অদ্ভুত অপরিচিত বস্তু দেখলে তাকে বোঙ্গা-রূপে প্রতিপাদনের মধ্যে ম্যানা-জাতীয় বিশ্বাস ধরা পড়ে, আবার বোঙ্গা-কুড়ি ও বোঙ্গা-কোড়ার গল্পে বোঙ্গা-কন্যা হয়েছে মানব-তরুণের প্রেমের পাত্রী অথবা বোঙ্গা-কুমার হয়েছে মানব তরুণীর প্রণয়পাত্র। বোঙ্গাবাদের যথার্থ স্বরূপ উন্মোচন বোধহয় গভীরতর পর্যবেক্ষণের অপেক্ষা করছে। (পৃঃ ৮০,৮১,৯৩)

'সাংস্কৃতিকী' গ্রন্থে যে সকল তথ্য ও ঘটনা আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে সেগুলি প্রধানত diffusion-এর প্রতিপাদক, অর্থাৎ, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সংস্কৃতির সঞ্চালন প্রতিপন্ন করে। ভারতে আগত কিংবা ভারত থেকে অন্যত্র প্রেরিত সাংস্কৃতিক উপকরণ সম্বন্ধে খণ্ড খণ্ড আলোচনার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি। দেশজ ও বহিরাগত উপকরণের সমন্বয় হচ্ছে সর্বদেশের সংস্কৃতির ইতিকথা। এর ব্যতিক্রম কোনো দেশ নয়, ভারতও নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ উত্তমর্ণ, কোথাও বা অধমর্ণের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বহু কাহিনী এখন অন্ধকারের গহ্বরে, বহু ঘটনা হিসাব নিকাশের বাইরে। কিছু কিছু উদ্ধারপ্রাপ্ত ইতিবৃত্ত আমাদের বিস্ময় জাগ্রত করে।

দেশ হতে দেশান্তরে সাংস্কৃতিক বিকিরণের নমুনা হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের নাম-জড়িত জাতক-অবদানের ভোট দেশ বা আধুনিক তিব্বত, চীনদেশ, কোরিয়া ও জাপান পরিক্রমা। বৌদ্ধ ভাবধারার মতো ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দ্বারাও ভারতের বাইরে এক সময়ে প্রবাহিত হয়েছিল। তখন ভারত হচ্ছে

সাংস্কৃতিক বিকিরণের কেন্দ্রস্বরূপ, ভারতীয় বণিক ও ব্রাহ্মণ
চিন্তাধারা, গল্প-উপাখ্যান বহির্বিশ্বে প্রচারের জন্য সমুদ্র-পথের দুস্তর
অতিক্রম করছেন। যবদ্বীপে অগস্ত্য পূজার প্রচলন, মধ্য যবদ্বীপের
অঞ্চলে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের তিনটি মন্দির-গাত্রে খোদিত 'রামায়ণ'
চরিত্র'-এর চিত্রাবলী, প্রাচীন যবদ্বীপীয় 'কবি' (kawi) ভাষায় 'মহাভার
গদ্য অনুবাদ—ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রচারকদের কীর্তি। একটা
লক্ষণীয় যে যবদ্বীপীয় 'মহাভারত'-এ অর্জুনের লক্ষ্যভেদের কথাও নেই,
পঞ্চপতিত্বের কথাও নেই, উপরন্তু যুধিষ্ঠিরের পত্নীরূপেই দ্রৌপদীকে
হয়েছে। ইন্দোচীনের কম্বুজদেশে অঙ্কর-বাৎ-এর বিষ্ণু মন্দির, এই
ভিত্তিগাত্রে উৎকীর্ণ 'রামায়ণ'-চিত্র, শ্যামী ভাষায় 'রামকিয়েন্' বা 'রাম-
কম্বুজের খ্মের জাতি, শ্যাম-রাজ্যের মোন্ জাতি, মালয় উপদ্বীপের
(malay) জাতি, বলিদ্বীপীয় ও যবদ্বীপীয় অধিবাসীগণের মধ্যে
রামায়ণী উপাখ্যান—ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।
কোচিন-চীনে চাম (cham) জাতির লোকেরা এখনও বিকৃত ব্রাহ্মণ
পালন করে। শ্যামদেশীয় মহাচক্রী রাজবংশের প্রত্যেক রাজা 'রাম'
অভিহিত। যবদ্বীপীয় জনশ্রুতিতে রাম ও সীতা মানবজাতির আদি
মাতারূপে কল্পিত হয়েছেন। যবদ্বীপের লোকেরা বর্তমানে ইসলাম ধর্মা
হলেও ছায়ানাট্য ও নৃত্যনাট্যের ভিতর দিয়ে 'রামায়ণ'-মহাভারত
কাহিনীগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের ধারণা যে এই সব কাহি
বর্ণিত ঘটনা যবদ্বীপেই ঘটেছিল। এজাতীয় বিশ্বাস থেকে সূচিত
বহিরাগত সাংস্কৃতিক উপকরণ ধীরে ধীরে আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহ
(পৃঃ ১৪—৪১)

মনিপুরীরা ভোট-ব্রহ্ম-শাখার অন্তর্ভুক্ত একটি গোষ্ঠী, কিরাত
পরিচিত গোষ্ঠীর একাংশ। এদের মধ্যে প্রবেশ করেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব
বাংলা লিপি। অর্জুনের আগমন সংক্রান্ত ঐতিহ্যের অনুসরণে মণি
কয়েকটি স্থানের নামকরণ হয়েছে। বৈদিক সাত গোত্রের অনুকরণে
গোত্রের কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। যথা, অঙোম্ বা ভরদ্বাজ-গোত্র,
কাশ্যপ গোত্র ইত্যাদি। (পৃঃ ১৭৮, ১৮৩, ১৮৮)

দ্রাবিড় ও আর্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটে
সে কাহিনীও কম বিস্ময়কর নয়। দ্রমিল্-এর রূপান্তর হচ্ছে তমিল,

বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় বা তামিল রূপটির সঙ্গে পরিচিত। ব্রাহ্মণ্য আদর্শের অন্তর্গত চতুর্বর্গের ধারণা দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। তামিল ভাষায় ধর্ম হচ্ছে অরম্, অর্থ হচ্ছে পোরুল্, কাম ও মোক্ষ হচ্ছে যথাক্রমে ইন্পম্ ও বীটু। তামিল কবি তিরু বল্লুবর্-এর কুরল বা মুপ্পাল কাব্যে প্রথম তিন বর্গ আলোচিত হয়েছে। মুপ্পাল-এর অর্থ প্রথম তিনটি বর্গ। চারিটি বর্গকে বলা হয় নাল্-পাল। সংস্কৃতের প্রভাব যেমন তামিলের উপর পড়েছে, তেমনি সংস্কৃতে তামিল প্রভাবের নিদর্শনও রয়েছে। সংস্কৃত 'নগর' শব্দটি এসেছে তামিল থেকে, এর মূল অর্থ ছিল বাসভূমি, প্রাসাদ। (পৃঃ ৪৮—৫২, ৫৭, ৫৮, ৬৭)

বহির্বিশ্বের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে চীনদেশীয় দার্শনিক লাওৎসির নামে প্রচলিত 'তাও-তেঃ-কিঙ্' গ্রন্থ সংস্কৃতে অনূদিত হয়। এই অনুবাদ-পুস্তক বর্তমানে অবলুপ্ত। তাও-তত্ত্বের অর্থ হচ্ছে পথ। সুনীতিবাবুর মতে তাও হচ্ছে বৈদিক ঋত-কল্পনার সজাতীয়। (পৃঃ ১০১—১০৫)

তুর্কী ও ইরানীদের দ্বারা উত্তর ভারত বিজয়ের পর ইসলামীয় সুফী সাধন-তত্ত্ব ভারতে প্রচারিত হয়। সুফী আদর্শ হচ্ছে মারিফৎ বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান। গ্রীক gnosis, নসিস থেকে মারিফৎ-এর ধারণা এসেছে। সুফী মন্ত্র অন-ল্-হক্ বাঙ্গালি সমাজে সুপরিচিত। এর অর্থ—"আমিই সত্য।" এর অনুরূপ হচ্ছে উপনিষদীয় মহাবাক্য—"অহং ব্রহ্ম অস্মি"—আমিই ব্রহ্ম। সুফী মন্ত্রের উপর বেদান্তের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। এই মন্ত্রের সাধক মন্‌সুর-এর প্রাণদণ্ড-কাহিনী একটি ঐতিহাসিক বিয়োগ-নাট্য। মন্‌সুর-এর ভারতে আগমন যদি নিরর্থক না হয়, তাহলে তাঁর উপর বেদান্ত-মতের প্রভাব অনুমান করবার একটি সূত্র পাওয়া যায়। (পৃঃ ১১৫—১১৮)

সুফী মতের মধ্যে গ্রীক নব্য-প্লাতোনিক ধারা এবং সম্ভবত বেদান্তের ভাবধারা একত্র মিলিত হয়েছে। সুফী দর্শনের ক্রমবিকাশের ফলে ঈশ্বরকে মাশূকা বা প্রেমাস্পদা নারীরূপে কল্পনারীতি দেখা দেয়। হাফেজের কবিতায় মাশূকা-কল্পনার সাক্ষাৎ মেলে। সুনীতিবাবু বঙ্গীয় বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে সুফী প্রভাব অনুমান করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রায় জনক-স্বরূপ রূপ ও সনাতন ফারসী ভাষাতে পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তাঁদের পক্ষে মাশূকা-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। বৈষ্ণব মধুরভাবের সাধনায় ঈশ্বর প্রেমাস্পদরূপে গণ্য হয়েছেন,

ঈদৃশ ধারণায় প্রচ্ছন্ন সুফী প্রভাব থাকতে পারে। (পৃঃ ২২০, ২৩২, ২৩৩)

এস্থলে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধন- জীবের আরাধ্য যুগল মূর্তি, রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব, শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণ নন। কৃষ্ণের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক ঠিক প্রেমিকা ও প্রেমিকের সম্প কেননা সিদ্ধ অবস্থাতেও জীব রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকার পেতে পারে জীবের লক্ষ্য রাগানুগা ভক্তি। সিদ্ধ জীব রাধার দাসী, অর্থাৎ মঞ্জরী প্রাপ্ত হয় এবং রাধার সেবাধিকার লাভ করে। জীবের পক্ষে মধুর তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িণী হওয়া নয়, পরন্তু রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম-লীলা উপভোগ। এই কল্পনার সঙ্গে সুফী কল্পনার সাদৃশ্য আছে মনে হয় না। সুতরাং সুফী প্রভাব আন্দাজ করা কঠিন। একথা স্বীকার্য যে মধ্যযুগের কবীর প্রভৃতি সন্ত সাধকেরা আংশিকভাবে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

সুনীতিবাবু বিভিন্ন দেশের মধ্যে, বিবিধ জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক বি সূচক উপকরণ সংগ্রহে দক্ষ। তাঁর সংগ্রহের দ্বারা diffusionism সাংস্কৃতিক বিকিরণবাদ শক্তি সঞ্চয় করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সংস্কৃতিই যে বিশুদ্ধ নয় বা বহিঃপ্রভাবমুক্ত নয় এই ধারণাই যুক্তিযুক্ত, এ পরমতসহিষ্ণুতার দুস্তর বাধাগুলি ধীরে ধীরে অপসারিত হবে এ সংস্কৃতির বিকাশ হবে সহজতর।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক কবিতা

রাম বসু

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এমন একজন কবি যাঁর প্রতিটি কবিতা সযত্ন অভিনিবেশের দাবি রাখে এবং বিতর্কমূলক হয়ে ওঠে। নিন্দা বা প্রশংসার বাঁধা বুলি বাদ দিয়ে যে প্রশ্ন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তা হচ্ছে কবিতার স্বরূপ। অর্থাৎ সুভাষ মুখোপাধ্যায় এমন এক জাতের কবিতায় হাত পাকিয়েছেন যা কাউকে রীতিমতো পীড়িত করবে এবং কাউকে দেবে গভীর তৃপ্তি। কেউ বলবেন : ওটা কবিতা হলো না, ও একটা ভালো রিপোর্টাজ। কেউ বলবেন : ওটাই কবিতা, ওর মধ্যে আমি আমার মুখ দেখতে পেয়েছি। সিদ্ধির কথা বাদ দিলাম। সময় একমাত্র তার বিচারক। 'আর শেষ বিচারে ব্যক্তিগত ভালো লাগাই তো কবিতার পক্ষে বড় কথা। কিন্তু যে কবিতা কবিতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণের প্রশ্ন তোলে সে কবিতার বিরাট তাৎপর্য নিশ্চয়ই থাকে। কারণ, প্রত্যেক সার্থক কবিতা তো এক হিসেবে কবিতার নতুন সংজ্ঞা ; বিশেষ করে একেবারেই এই সাম্প্রতিক কালে যখন্ অধিকাংশ কবিই প্রথাসিদ্ধ কবিতা রচনার জন্য প্রবল উৎসাহে চঞ্চল।

চাঞ্চল্য যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে অনুপস্থিত এ কথা বলা যায় না। তিনিও সময়ের টান নাড়িতে অনুভব করেছেন এবং সেই টানের জোরে পরিবর্তন এসেছে তাঁর চেতনায়। 'পদাতিক'-এর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'যত দূরেই যাই'-এর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তফাৎ কোনো পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। এই পরিবর্তন আচমকা নয়। একটা বিশেষ ধারা অনুসরণ করে এই পরিবর্তন এসেছে বলেই তা গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারার পরিণতি সম্পর্কে কৌতূহল থেকেই যায়।

আমার মনে হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার বিশেষ ধারা দুটি লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত। প্রথমটি হলো : নিজের ভাবনাকে বৃহত্তর মানুষের ভাবনা এবং বৃহত্তর মানুষের ভাবনাকে নিজের চেতনার অঙ্গীভূত করে নেবার প্রবণতা বা দীক্ষা। দ্বিতীয়টি হলো : আবেগ এবং সমগ্র

যত দূরেই যাই। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন। তিন টাকা।

কবিতাকে অবজেকটিভাইজ করার দুঃসাহসিকতা। দুঃসাহসিক
আমি অতি সচেতন ভাবে প্রয়োগ করেছি। কারণ অতি সাম্প্র
কবিতা দিগ্‌বিদিগ জ্ঞান শূন্য হয়ে সাবজেকটিভ হবার জন্য
তখনই সুভাষ মুখোপাধ্যায় আপন স্বভাবের প্রতি বিনীত নি
কবিতার অনিবার্য নিয়তির দিকে চলেছেন। এই যাত্রায়, এ
দেখা যাচ্ছে, তিনি একা এবং তাঁর অনুজেরাও সম্ভবত দিশাহার
অনুজেরাও তাঁদের নিজস্ব স্বভাব আবিষ্কার করার জন্য নিঃসঙ্গ,
অগ্রজ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই পেয়েছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যের মুক্তি হলো তাঁর দেশ।
বলতে চলতি কথার স্বদেশপ্রেম বা রাজনীতির প্রাধান্য বো
এই দেশ বলতে বোঝায় ধ্যান-জাত আধ্যাত্মিক আশ্রয়, যা বি
কাছে বিভিন্ন নামে ও স্বরূপে ধরা দেয়; যা প্রত্যেক কবিতা
তাই জীবনের জটিলতা যত দুঃসহই হোক, সহজ বিশ্বাসের
প্রতারণাই নামুক, কবি অবিচল নিষ্ঠায় তাঁর লক্ষ্যকে গেঁথে নি
বর্শাফলকে :

"আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকানো উঠোন
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা
আমি যত দূরেই যাই।"

এ কি নসটালজিয়া? সে গ্রাম তো ভেঙে যাচ্ছে, শহর
থাকছে না নিকানো উঠোন। লক্ষ্মীর পা আঁকার রেওয়াজ তো
কলকাতার সংকর কালচারের কৃপায়। এ বিষয়ে সুভাষ মু
যে সচেতন নন তাও মনে হয় না। তিনি সম্ভবত ভালো ভাবে
যে আজকের এই বিকৃতি, তা যত অন্ধতম হোক, চিরস্থায়ী নয়।
ইংরেজী আধা-বাঙালী কালচারের আবিলতা বা শৌখিন বিশ্বমা
সুলভ পোশাক যত মোহাবিষ্টই করুক না কেন, বাংলার মা
প্রাণধর্মের তাগিদেই তার দেশের আত্মা, এবং সে জন্য তার নিজের
আবিষ্কার করবেই অন্য এক 'গোরা'-র মতো। এ প্রয়াস আজ যত
হোক আগামী দিনে সংহত হতে বাধ্য।

নিজের আত্মাকে আবিষ্কার করার তীব্র পদ্ধতি, হয়তো অ

ষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে কাজ করতে আরম্ভ করেছে বলেই তাঁর সাম্প্রতিক
িতাবলীতে বিশেষ চরিত্র স্থান পাচ্ছে। সে চরিত্রগুলি নিজের জোরে
ত্র হয়ে উঠছে এবং কবির ভূমিকা সেখানে নিতান্ত নগণ্য। প্রসঙ্গত
যাক 'পাথরের ফুল'। গোটা কবিতা একটা পবিত্র জ্বালায় অভিষিক্ত।
ানে গড়-পড়তা জীবনের নোংরামি ভণ্ডামি ক্লেদ আছে। আছে শাণিত
ক। 'পদাতিক' কিম্বা 'চিরকুট'-এর যুগে হলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়
হয় এখানেই থেমে যেতেন। বয়স ও অভিজ্ঞতার পর বোঝা গেল
নঙর্থক দিকটি যথেষ্ট নয়। তাই চাবুকেও আনন্দ কম। বিদ্রূপের
য় কাজ করে গভীর বেদনা। এই বেদনাবোধই আমাদের আরও কাছে
ন নেয়।

"ফুলগুলো সরিয়ে নাও
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়
ফুল
জমতে জমতে পাথর।"

এবং আমরাও "শুধু কথায় তুষ্ট" হতে চাই না; আমরাও যেতে চাই

"কথার সেই উৎসে
নামের সেই পরিণামে
জল মাটি হাওয়ায়।"

উক্তির এই বিশেষ কোমল ভঙ্গিটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক
। ইতিপূর্বে তাঁকে দেখা গিয়েছে ঘোষকের ভূমিকায় অথবা দেখা
ছে প্রফেটিক্ উক্তির আতিশয্যে। সেখানে নিজেকে বোঝা ও বোনার
বড় হয়ে দেখা দিয়েছে বোঝানোর ব্যাকুলতা। আলোচ্য গ্রন্থে
মুখোপাধ্যায় অন্য ভাবে উপস্থিত। এখানে কথা বলার ভঙ্গি বড়
গত ও ঐকান্তিক। এখানে কবি নিজেকে ও পরিবেশকে একই সঙ্গে
নিতে চাইছেন এবং সে জন্য এই কবিতা পেয়েছে লিরিকের তীব্রতা।
সঙ্গে 'যেন না দেখি', 'কে জাগে' বা 'এখন যাব না' বিশেষ করে স্মর্তব্য।
ঙ্গি যেহেতু ব্যক্তিগত সেহেতু প্রচলিত অর্থে ছন্দ আর কবির বাহন
যদিও প্রচলিত ছন্দে নতুন জাদুমন্ত্র দিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ওস্তাদ।
াত্রা মিলের মধ্যে একটা বাইরের জিনিস থাকে। সেটি শোভন
তা। কিন্তু গদ্যছন্দ তাৎক্ষণিকতার উক্তি; মানুষের সমগ্র সেখানে
লে। পর্বের বাঁধাধরা ওঠানামা ঘুচে গেলে শব্দের নিয়মিত ধ্বনির

বদলে আসে স্বাভাবিক ও স্বনির্বাচিত ধ্বনিমাহাত্ম্য ; যা উদ্ভূত
মাত্র কবিতারই তাগিদে। অভ্যাসের দাসত্বে যা মলিন তাতে
দীপ্তিও বিড়ম্বিত হয়, যেমন পারা-ঝরা আয়নায় মুখ দেখা।
কবিতায় নিজেকেই নিজে আবিষ্কার করতে হয় এবং সেই আবিষ্ক
যেহেতু বন্ধুর তাই প্রকাশের অনন্যতা পূর্বনির্দিষ্ট ছন্দের কাঠামো
মেকি হবার আশঙ্কা থাকে বলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো স্বনি
বিন্যাসীও অবশেষে নিরাভরণ গদ্যের কঠোরতায় নেমে আসেন। এ
নিজস্ব গতি আছে। সে গতি যান্ত্রিকতার চাপে পীড়িত নয়। সে
অনুভূতির বিশুদ্ধতায় দীপ্ত। আমি বলতে চাই যে সুভাষ মুখোপাধ্যা
খেয়াল অনুসারে প্রচলিত ছন্দ ত্যাগ করেন নি ; তাঁর কবিতার
জন্যই এই ছন্দ তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছে। তবুও এই গদ্যে
মাহাত্ম্য কতদূর অর্জন করা যায় তা এখনও পরীক্ষাসাপেক্ষ।
কিম্বা লরেন্স যে মাহাত্ম্য অর্জন করতে পারেন তারই সমতুল্য মাহাত্ম্য
শব্দের গঠনের মধ্যে পাওয়া যায় কিনা তা এখনও দেখার বিষয়। 'বাইবে
সামস্‌গুলি গদ্যে রচিত। কিন্তু সে এক অসাধারণ কবিতা ; পৃ
কবিকে আকৃষ্ট করেছে অনুরূপ মহান গদ্য কবিতা রচনায়। সামস্‌গু
ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।। তাই ইংরাজ কবিদের কাজ আমাদের তুলনায়
সহজ। আমাদের এমন ধরনের ঐতিহ্য নেই। আমাদের শাস্ত্র ছন্দে
আমরা তাই সহজে প্রাচীনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি না। আমাদে
ছন্দকে তার শ্রমলব্ধ ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে হবে। সুখের কথা প্রচলি
শিক্ষিত সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্য ছন্দকে সমান আগ্রহে স্বীকার কর
হয়েছেন। তাই তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় শব্দের সঙ্গীত যদিও মাঝে
গড়ে উঠতে উঠতে ভেঙে যাচ্ছে, তবু বিশ্বাস রাখি একটি দুঃসাহসিক
তিনি সিদ্ধ করবেন।

আবেগ এবং সমগ্র কবিতাকে অবজেকটিভাইজ করার আগ্র
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্বভাবের মধ্যে নিহিত, তাই দৈনন্দিন জীবনে
ঘটনা, প্রাত্যহিকতার নিরাভরণতা তাঁর কবিতায় অঙ্গীকৃত। অর্থাৎ
যাকে চলতি কথায় একজলটেড পোয়ট্রি বলে থাকি অধুনা সুভাষ মুখো
তা লিখছেন না। সিঙ্গের কথায় বলা যায় যে মানুষ যখন
দোকানঘর তৈরি করার আনন্দ হারায় তখন তারা সুন্দর সুন্দর
নির্মাণ করতে পারে না।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়তো আমাদের জীবনের তুচ্ছ ঘটনাকে গভীর তাৎপর্যে ভূষিত করতে চান। 'দিনান্তে', 'পোড়া শহরে', 'লোকটা জানলই না', 'আলো থেকে অন্ধকারে' প্রভৃতি কবিতায় এই উক্তির প্রমাণ মিলবে।

কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায় যে এই কবিতাগুলি একটি মাত্র চিত্রকল্প বা একটি মাত্র উক্তিকে আঁকড়ে থাকে। যেমন 'পা রাখার জায়গা' শীর্ষক কবিতার শেষ পংক্তি :

"ও দাদা, একটু এগিয়ে যান—
দয়া করে
স্যার, একটু পা রাখার জায়গা।"

দীর্ঘ বর্ণনা, যা মাঝে মাঝে অনাবশ্যক, ও ভাবনার পর লোকটা যখন পা রাখার জায়গার জন্য আবেদন জানায় তখন পাঠকের মনে হয় এই বাসটি রাষ্ট্রীয় পরিবহনের একটা যাত্রীবোঝাই বাস নয়, এই বাসটা জীবন। অথবা ধরা যেতে পারে 'দিনান্ত' কবিতায় সূর্য, সন্ধ্যা ও হাওয়ার তিনটি চিত্রকল্প। এই সব কবিতার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো এই যে পাঠকেরা আগে থেকেই সচেতন হয়ে ওঠে স্টাণ্ট জাতীয় নাড়ার জন্য এবং এই সচেতনতা কবিতার পক্ষে ক্ষতিকারক। এমন ধরনের তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করে সার্থক কবিতা রচিত হয়েছে ইওরোপে এবং রবীন্দ্রনাথও করেছেন। কিন্তু সেই সব কবিদের একটা বড় সুবিধা এই ছিল যে তাঁরা সবাই জীবনের আধিভৌতিক ভিত্তিভূমি বা মেটাফিজিক্যাল বেসিসকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে বদলেয়রের গদ্য কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সেই সুবিধা নেই। এবং নেই বলেই জীবনের এই জটিল প্যাটার্নকে যতটা আত্মস্থ করার দরকার ততটা হয় নি বলে বোধ হয়। আরাগঁ এলুয়ারের কবিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তাঁদের কবিতা সংবাদপত্র। আগামী দিনের পৃথিবীর সংবাদ সেখানে পাওয়া যাবে। যে মানুষটা জন্মাচ্ছে তার জটিল পদ্ধতি ও যন্ত্রণা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সার্থক ভাবে ধ্বনিত হোক অনুজ হিসাবে এই প্রার্থনাই আমি করি।

আমার ধারণা 'যত দূরেই যাই' কবির স্বেচ্ছা-আরোপিত সুন্দর সংকট ও সংকট থেকে উত্তরণের শ্রদ্ধেয় প্রচেষ্টা হিসাবে পাঠকদের কাছে আদৃত হবে এবং এই কবিতার পরিণতি কোন দিকে সেই বিষয়ে চিন্তা করার সুযোগ দেবে।

বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ

হিরণকুমার সান্যাল

বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব আকস্মিক ; তার পরিণাম অকল্পি
শান্তিদেব ঘোষ তাঁর 'রবীন্দ্রসংগীত' বইতে লিখেছেন যে ১৩২২ সা
৪ঠা পৌষ 'ডাকঘর' নাটকের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেত
আশ্রমবাসীদের বলেছিলেন : "ডাকঘর যখন লিখি তখন হঠাৎ আ
অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল।...প্রবল একটা আ
এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবী প্রদ
করতে হবে—সেখানকার মানুষের সুখদুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে
এই সময়ে, অর্থাৎ তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স পূর্ণ হবার কিছু দিন পরে, শ্রী
নির্ঝরিণী সরকারকে তিনি লিখেছিলেন : "মা, আমি দূর দেশে যাবার
প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে অন্য কোনো প্রয়োজন নাই কেবল কিছু
থেকে আমার মন এই বলবে যে, যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবী
একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছে বিদায় নেব।" এর এক
পরে বিদেশ যাত্রা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল চিকিৎসার জন্যে। বিশ্বের সাংস্কৃতি
ইতিহাসের এক বিস্ময়কর পর্বের এই সূচনা। এরপর শুরু হলো রবীন্দ্রনা
বিশ্ববিহার।

'পথ ও পথের প্রান্তে' বইতে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে লিখেছিলেন : "
য়ুরোপ ভ্রমণের বৃত্তান্ত যা কোথাও প্রকাশ পেল না তার দাম খুব বেশি।" রবী
সদনের রাশি রাশি কাগজপত্র ঘেঁটে এই অপ্রকাশিত বৃত্তান্ত অন্তত এক
বাঙালি যতটা উদ্ধার করতে পেরেছেন তা অসম্পূর্ণ হলেও তার দাম খুব বে
এ কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করব। এই বৃত্তান্ত* যে মূল্যবান
কারণ শুধু কবির ভ্রমণবৃত্তান্ত নয় পৃথিবীর নানা দেশের অগণিত নরনারীর
রবীন্দ্রনাথ কি রকম আশ্চর্য সাড়া জাগিয়েছিলেন তার অনেক দৃষ্টান্ত লে

*বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ। মৈত্রেয়ী দেবী। গ্রন্থম। সাড়ে সাত টাকা।

এই বইটিতে সংগ্রহ করেছেন। এই বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ না হলেও বিষয়গুণে
মনোজ্ঞ, আরো মনোজ্ঞ হয়েছে লেখিকার সাবলীল লিপিকৌশলে।

রবীন্দ্রনাথ সবশুদ্ধ বারো বার বিদেশযাত্রা করেন ; তার মধ্যে সতেরো
ও উনত্রিশ বৎসর বয়সের বিদেশভ্রমণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু
তৃতীয় বার একান্ন বৎসর বয়সে তিনি যখন বিলেতে যান—যদিও প্রধান
উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসা, যা পুরোপুরি সার্থক হয়েছিল—তিনি সঙ্গে
নিয়েছিলেন 'খেয়া', 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি'র অনেকগুলি গান ও কবিতার
ইংরেজি অনুবাদ। এই অনুবাদের খাতাটি কবি লণ্ডনে পৌঁছে দিলেন তাঁর
বন্ধু রোটেনস্টাইনের হাতে। মৈত্রেয়ী দেবী লিখছেন : "সেই শুভ মুহূর্ত থেকে
তার দিগ্বিজয়ের শুরু।" অর্থাৎ বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশের
ছাড়পত্র হলো ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'।

এই দিগ্বিজয়ের অনেক কথা জানা—অনেক নয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু
সমাদর পান নি, তীব্র সমালোচনাও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে,
কিংবা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো হয় নি, কেননা অনেক অপ্রিয় কথা তাঁর
কানে পৌঁছয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রসদনের নথিপত্রের মধ্যে এমন অনেক
জিনিস পাওয়া যায় যার মূল্য শুধু সাহিত্যিক নয়, সমাজতাত্ত্বিক ও
রাজনৈতিকও বটে। ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত একটি ইংরেজি বইতে এই
জাতীয় জিনিসের অনেক নমুনা পাওয়া যায়। বইটির নাম 'Rabindranath
Through Western Eyes', লেখক এ. অ্যারন্সন্। ঐ সময়ে তিনি
বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ছিলেন।

ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশ হতে না হতেই সারা ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায়
ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে আরম্ভ হলো তুমুল আলোড়ন—কবি ও তাঁর
কাব্য উভয়কে নিয়ে। ইওরোপ সে সময়ে রবীন্দ্রনাথকে কি চোখে দেখেছিল
অ্যারন্সন্ তার একটি নমুনা দিয়েছেন ইংল্যাণ্ডের 'দ্য নেশন' কাগজ
থেকে :

"During his recent residence in London, it was a lesson in irony to watch his meditative figure and the face as harmless as a dove while he sat in unruffled silence among the flickering tongues of distinguished people who had never meditated in their lives, but no

doubt, combined the wisdom of the serpent wi
other qualities."

এই উক্তিটি প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালের ২৫ অক্টোবর। অ্যারন প্রসঙ্গে বলেছেন: "Tagore the man was a mystery to m And his personality seemed to them ambiguous not be he was a poet, but because he was an Indian."

মোটকথা বলা যেতে পারে অল্প কয়েকজন ছাড়া বেশি ইওরোপীয়ের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা হলো কবি হিসেবে ত যতটা মিষ্টিক হিসেবে—এবং যেহেতু মিষ্টিক অতএব ঋষি ও রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নিজেকে কবিই বলতেন—ঋষির সাজ তিনি স্বতঃপ্র পরেন নি। কিন্তু এই সাজে তাঁর বিশেষ আপত্তিও ছিল না। (" enough, the robe of the prophet he may not have d himself but he did not decline it when others offered him." :—'The Economic Weekly,' Bombay, May 13, 1961)

ক্রমশ বিদেশে তাঁর কবিখ্যাতি হলো ম্লান কিন্তু অপরদিকে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর উদার মানবিকতার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক বিশিষ্টতম মানুষদের অন্যতম বলে সর্বদেশে স্বীকৃত হলেন। এই বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে মৈত্রেয়ী দেবীর বইতে। এইগুলি লেখি আয়াসে সংগ্রহ করে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সময়ের অভাবে আরো অনেক মূল্যবান তথ্য তিনি আমাদের দিতে নি—সময়ের অভাব, কেননা, রবীন্দ্রনাথশতবার্ষিকী উৎসবের সময়ে প্রকাশ করার তাগিদ ছিল। আর একটি অসুবিধা ছিল সব বিদেশ না জানা—যেমন জার্মান।

লেখিকা জার্মান দার্শনিক কাউন্ট কাইসারলিং-এর সঙ্গে রবীন্দ্র বন্ধুত্বের কথা ও তাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী উৎসবের কথা উ সঙ্গে উল্লেখ করে আক্ষেপ করেছেন এই যজ্ঞের "যদি কোন পূর্ণ ছবি মনের সামনে থাকত তবেই আমি তা আমার পাঠকদের কাছে পারতাম।" এই উদ্দেশ্যে লেখিকা শরণাপন্ন হয়েছিলেন "দেবতুল্য" কা পুত্রের। অনুমান হয় এই যোগাযোগ ঘটেছিল শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র খানিকক্ষণ সেই সময়কার জার্মান কাগজপত্রের পাতা উলটে প্রখ্যাত কা

"গৃহহীন অজ্ঞাতপরিচয়" পুত্র লেখিকাকে বললেন, "এই কাগজগুলি পড়ে আমার ধারণা হল যে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে জার্মানিতে এমন উন্মাদনা এসেছিল যে তাঁর হাতে যদি টাকা থাকত তিনি যদি একটু ব্যবস্থা করতে পারতেন তাহলে অর্ধেক জার্মানী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনে চলে আসত।"

মৈত্রেয়ী দেবীর বই থেকে জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিরোধিতাও কিছু হয়েছিল। কাউন্ট-তনয় তাঁকে বলেন, "এই সব ঈর্ষা-প্রসূত কথা শুনে আমার বাবা ভারি চটে গিয়েছিলেন—কবির কাছে সহজে কাউকে ঘেঁষতে দিতেন না। পাছে রবীন্দ্রনাথকে বাজে লোকে বিরক্ত করে তাই কাউন্ট কাগজে এক বিবৃতি দেন যে যাঁরা "এই ঋষির সঙ্গে নির্লিপ্তভাবে, গভীরভাবে, সত্যসত্যই মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে, পূর্ব পশ্চিমের মিলন সম্বন্ধে আলোচনা করতে চান, তাঁরা আসুন, অন্যরা বিরত হন।" এরপর ডার্মস্টাট (অর্থাৎ ধর্মনগর)-এ তাঁর 'উইস্‌ডম্ স্কুল'-এ রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে কাইসারলিং যে বন্দনা রচনা করেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবী তার ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছেন। বন্দনাটি এক মজার জিনিস বটে।

"ওঁ প্রজ্ঞার দেবতা পবিত্র গণেশকে নমস্কার। অস্তাচলের দেশে ধর্মনগর নামে একটি নগর আছে—সেখানে রবীন্দ্রের বন্ধু এক ক্ষত্রিয় বাস করে। সে একটি বিদ্যালয় করেছে এবং তার কাছে তিনি এসেছেন। তাঁর এই ক্ষত্রিয় বন্ধু এতদিন অস্তাচলের দেশের রীতিতে যা শিখিয়ে এসেছে—যে রাজকীয় জীবনের কথা, জ্যোতির্ময় সত্তার কথা বলে এসেছে, আজ পাশ্চাত্ত্য জগতের মানুষের কাছে মূর্তি ধরে সেই সত্যই প্রকাশিত হয়েছে। সেই সমস্ত একের বিগ্রহ মূর্তি আজ পূর্বদেশ থেকে এসেছেন।"

প্রায় ঐ সময় থেকেই জার্মানিতে নাৎসিবাদের পূর্বাভাস বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল। বছর দশেক পরে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত 'দেবতুল্য' কাউন্টের কমিউনিজম্ সম্বন্ধে এই উক্তিটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

"But it is clear, nevertheless, that neither the materialism, nor its collectivism, nor, above all, its Satanism are true to our profoundest and most essential aspirations. The Russian Revolution is a more magni-

ficent confirmation of the truth of the myth of Lucifer than any event of ancient history."

কোথায় 'রাশিয়ার চিঠি'র লেখক রবীন্দ্রনাথ ও কোথায় 'দেবতুল্য' দার্শনিক কাউন্ট !

কাউন্টের আর একটি উক্তিও স্মরণ করা যেতে পারে :

"A Republican, a Democrat, a Protestant, who is inwardly bound by the belief in definite forms, is infinitely less free from the point of view of the spirit than an aristocrat, nay even a tyrant, who lives according to the law of his own creative conscience."

'দেবতুল্য' কাউন্টের ফ্যাসিবাদ এখানে প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'Rabindranath Through Western Eyes'-এর লেখক অ্যারন্‌সন্‌-এর মতে ডার্মস্টাট-এর উৎসবের পিছনে ছিল কাইসারলিং-এর চক্রান্ত। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উৎসবের উল্লেখ করে তাঁর 'On The Edges of Time' বইতে লিখেছেন : "কাউন্ট কাইসারলিং ও গ্র্যাণ্ড ডিউক হেস এক রবিবার আমাদের মোটরগাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যান। একটি বাগানে গিয়ে আমরা মোটর থেকে নেমে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করি—এই সব লোকজন এসেছিল ছুটির দিনে আমোদ করতে। কাছেই ছিল ছোট্ট একটি পাহাড়। বাবাকে নিয়ে যাওয়া হলো এই পাহাড়ের উপর। সেখানে উঠে একটি পাথরের বেঞ্চিতে তিনি বসলেন। তারপর জনতা তাঁকে ঘিরে হঠাৎ শুরু করল গান—গানের পর গান। প্রায় দু-হাজার লোক জড় হয়েছিল। তাদের কেউ নেতা ছিল না। সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে তারা যে গান গেয়ে গেল তাতে কোথাও একটু বেসুর ছিল না। জার্মানি ছাড়া আর কোথাও এই ব্যাপার সম্ভব নয়"।

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে অ্যারন্‌সন্‌-এর মন্তব্য :

"Did Rabindranath know that most of these songs were of a narrow nationalistic kind, that the rather nauseating sentimentality of this summer morning on the mountain near Darmstadt, was not in the least spontaneous, but was very well rehearsed beforehand,

especially the singing of the German National Anthem? Did he know of the contemporary accounts of this modern version of the Sermon on the Mount in the daily press and the way it was exploited by the chauvinist right-wing parties? We are afraid he did not."

কাইসারলিং ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে অ্যারন্‌সন্‌-এর মন্তব্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

"In one way, at least, this strange friendship is fascinating and not without pathos. For here we see two great men belonging to the same age, the western philosopher with a leaning towards the East and the Eastern poet with a leaning towards the West, struggling side by side for certainty and truth, until their paths separate for ever, one being engulfed by the rising tide of Teutonic fanaticism and the other becoming more and more 'acutely conscious of the menace to man' and fearlessly fulfilling his destiny through 'insult and isolation'. But nothing made Rabindranath politically more conscious of this menace than his experience in Italy..."

কাইসারলিং-এর মতন লোকেদের চক্রান্তের কথা মনে করেই বোধহয় ঐ সময়ে জার্মানির এক সমাজতন্ত্রবাদী কাগজে লিখেছিল :

"Although he delivers his lectures before the privileged classes, we should not condemn him therefore. The bourgeoisie wants to draw him towards her, wants to fill her own emptiness with his abundance. Europe praises you as a poet and a seer; but it does not know and it does not search for your path. For those, who search it, are by pillars bound. They groan in their chains—

they rise menacingly—and one day they will
them. And the earth will tremble with their trium
shout—Freedom."

জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ যে অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তা অভূতপূর্ব।
বা ইংল্যাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ যাঁদের মুগ্ধ করেছিলেন তাঁরা ঐ দুই দেশের
মনীষী, কিন্তু জার্মানিতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁকে বরণ করেছিল
ভালোবাসা দিয়ে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'On The Edges of Time'
একটি মর্মস্পর্শী ঘটনার উল্লেখ করেছেন। মোটর গাড়িতে সুইটজার
ভ্রমণের সময়ে তাঁরা গিয়ে উপস্থিত হন রেল লাইন থেকে দূরে ছোট
গ্রামে। সেখানে হঠাৎ তাঁদের দেখা হয় জার্মানভাষী এক কৃষকের
তাঁর বাড়ি রবীন্দ্রনাথের বইতে ভরা, অবশ্য জার্মান অনুবাদে ও রবী
বলতে তিনি প্রায় অজ্ঞান। এই কৃষকটির বোনও তথৈবচ। তাঁর বিশে
বই ছিল 'চিত্রাঙ্গদা', 'ঘরে বাইরে' ও 'ডাকঘর'-এর জার্মান অনুবাদ।
সন্ধ্যায় তিনি ঐ বইগুলি থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনাতেন ঐ গ্রামের
বাসিন্দাদের। এই মহিলাটির জীবিকার উপায় ছিল নানা ভারতীয়
আঁকা চামড়ার কুশন তৈরি। এই সব নকসা তিনি সংগ্রহ করে
বটতলার এক 'রামায়ণ' থেকে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন যে কোথা
যে তিনি ঐ বইটি সংগ্রহ করেছিলেন তা এক রহস্যের ব্যাপার।

১২২১ সালে জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথের বই লক্ষ লক্ষ বিক্রি হওয়া
জার্মান মার্ক-এর অসম্ভব মূল্যহ্রাসের জন্য তাঁর প্রাপ্য মুনাফার অঙ্ক প্রায়
দাঁড়িয়েছিল।

উপযুক্ত মুনাফা পেলে বিশ্বভারতীর অর্থ সমস্যা থেকে রবীন্দ্রনাথ
পেতেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে তা ছিল না। ইতিপূর্বে ১৯১৬
আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে তাঁর যে প্রচুর অর্থ পাওনা হয়েছিল তাও তাঁর
পৌছয় নি, কেন না যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির ওপর হিসেবনিকেশের ভার
হঠাৎ তা হল দেউলে। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন শেষ পর্যন্ত পি
সাহেব অতিকষ্টে মাত্র কয়েক হাজার টাকা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন
এই টাকা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঋণ পরিশোধ করেন। এই ঋণ তিনি নিয়ে
শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্যে স্যার তারকনাথ পালিতের
কিন্তু তারকনাথ তখন জীবিত ছিলেন না, তাই তাঁর উত্তরা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি ঋণের টাকা কড়ায়গণ্ডায় শোধ করে দিয়েছিলেন।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথ বিদেশে গিয়েছিলেন রীতিমতো ভিক্ষার ঝুলি ঝুলিয়ে। কিন্তু তাঁর ভিক্ষাবৃত্তি নিষ্ফল হয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন যে তাঁর পিতার আশা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কোটিপতিরা তাঁর ঝুলি ভরিয়ে দেবেন। তখনকার ধনকুবের ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী মরগেনথো এই মর্মে তাঁকে আশাও দিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে মরগেনথো একদা তাঁর বাড়িতে এক ভোজসভায় ওয়ল স্ট্রীটের সেরা ধনকুবেরদের নিমন্ত্রণ করে কবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিই নাকি তাঁর ধনী বন্ধু-বান্ধবকে এই বলে টিপে দেন যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য ভালো চোখে দেখবেন না। এর পর ধনকুবেরের দল একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যান।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাতে তাঁর পিতার চরিত্র ফুটে উঠেছে উজ্জ্বলভাবে। ভারতীয় ধনকুবের বরোদার মহারাজার কাছ থেকে মোটা টাকা পাওয়া যেতে পারে এই রকম আভাস পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সুইটজ্যারল্যাণ্ডে মহারাজাকে নিমন্ত্রণ করেন তাঁর হোটেলে। নানা কথার পর টাকার কথা উঠলে কবি মহারাজাকে বললেন, দেখুন, আমার হাতে যে টাকা দেবেন ধরে নেবেন তা জলে দিয়েছেন। মহারাজা মহানুভব ছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু ঠিক জলে টাকা দেবার মতো প্রবৃত্তি তাঁর হয়নি।

ইটালির ব্যাপারটি রবীন্দ্রজীবনের খুব প্রীতিকর অধ্যায় নয়—মৈত্রেয়ী দেবীর ব্যাখ্যা সত্ত্বেও। কাইসারলিং যে 'টাইরাণ্ট'-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন, ইটালিতে তিনি সশরীরে আবির্ভূত হন মুসোলিনিরূপে। তাঁর ও তাঁর নন্দী-ভৃঙ্গীর, বিশেষত অধ্যাপক ফরমিকির, চক্রান্তে রবীন্দ্রনাথের ইটালিতে নিমন্ত্রণ হয় ১৯২৬ সালে। মুসোলিনির আতিথ্যে ও ব্যক্তিত্বে রবীন্দ্রনাথ যে মুগ্ধ হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুসোলিনির আলাপের একটি অনুলিপিতে। এই অনুলিপির লেখক অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এই ভ্রমণের পালায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন। এই বিষয়ে ইংরেজিতে লেখা মূল কাগজপত্র সম্ভবত রবীন্দ্রসদনে আছে।

রবীন্দ্রনাথ। আপনাদের অর্থাৎ ইওরোপের লোকেদের দৃষ্টি হলো বহির্মুখী

অর্থাৎ বস্তুনির্ভর আর প্রাচ্যের লোকেদের দৃষ্টি ...
ভবিষ্যৎ সভ্যতার জন্য প্রয়োজন এই দুইয়ের সমন্বয়ের।

মুসোলিনি। আমি তা মানি। প্রাচ্যের আছে অধ্যাত্মসম্পদ। ... তা প্রয়োজন। বিজ্ঞান যথেষ্ট নয়। অধ্যাত্মজীবন ... আমরা পূর্ণতা লাভ করব না।

রবীন্দ্রনাথ। বিজ্ঞানের শক্তি আছে কিন্তু নেই সৃষ্টির ক্ষমতা…

মুসোলিনি। সে কথা সত্য…

রবীন্দ্রনাথ। …প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের এক মহৎ সুযোগের সম... উপস্থিত হয়েছে…

(মুসোলিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জা...

রবীন্দ্রনাথ। রোম শহরে প্রমাণ পেয়েছি আপনার প্রবল ব্যক্তি... আপনি কি জানেন যে আপনার সম্বন্ধে বহু অযথা কথা... করা হয়েছে ? আমারও মনে অনেক সন্দেহ ও দ্বিধা ছিল... আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে সে সব দূর হয়েছে বলে... আনন্দিত।

মুসোলিনি। আমি তা জানি। কিন্তু উপায় কি ? আমাকে আমার... করেই যেতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ। হয়তো নতুন এক রোম গড়ে উঠছে। আমি দেখছি... সৃষ্টির সব লক্ষণ। স্বাধীনতা লাভ করার আগে কঠিন... প্রয়োজন আছে…আমার আশা আছে ইটালির ... সুমহৎ। কিন্তু শুধু শক্তি ও পার্থিব সম্পদ কোনো ... বড় করতে পারে না।…

ইটালি থেকে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন সুইটজারল্যাণ্ড। সেখানে ... রঁলা ও প্রবাসী ইটালিয়ানদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর মুসোলিনি ... রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ হলো। কিন্তু মুসোলিনি সম্বন্ধে তাঁর ঐ রকম ... হলো কি কারণে ? অ্যারন্‌সন্‌-এর মতে "but this time his in... went wrong, and instead of looking at Italy in terms of hi... nature and experience he indulged (as many other intelle... at that time) in wishful thinking, self-deception and unjustifiable optimism."

মনে রাখতে হবে অ্যারন্‌সন্‌-এর বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে যখন ফ্যাসিতন্ত্রের আসল চেহারা সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তদুপরি তিনি জার্মান য়িহুদি ; তাঁর পিতামাতা জার্মানি থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন প্যালেস্টাইনে ; সুতরাং ছেলেবেলা থেকে তাঁর হাড়ে হাড়ে ছিল ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে তিক্ততা।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২১ সালে জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথকে অনেকে য়িহুদি বলে অভিহিত করেছিলেন ও ভিয়েনার এক কাগজে এই সংবাদ প্রচারিত হয় যে রবীন্দ্রনাথের আসল নাম 'রব্বি নাথন', ও তাঁর শ্বশুর ওপেনহাইমার নাকি বম্বের এক বিত্তশালী বংশ-ব্যবসায়ী। অ্যারন্‌সন্‌-এর বইয়ে এর উল্লেখ আছে।

মৈত্রেয়ী দেবীও অনেক মজার খবর দিয়েছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ নাকি বার্ণাড শ-র একটি কার্টুন এঁকেছিলেন আর এই দুই মহাপুরুষের সাক্ষাতের আগে বার্ণাড শ-র স্ত্রী স্বামীকে বলেছিলেন যে শুধু নিজে কথা না বলে তিনি যেন কবিকেও দু-চারটি কথা বলার সুযোগ দেন।

আর একটি মজার ঘটনা এই : আমেরিকাতে সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট কবির লম্বা পোষাকের একটি অংশ তুলে ধরে এক ওপরচালাক যুবক নাকি জিজ্ঞেস করেছিল : "Hey, what is this ! Is this a kind of bath robe ?"

এই ঘটনার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ এক সাংবাদিকের কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে ঐ পোষাক শুধু বিদেশী এই বলেই বিদ্রূপের কারণ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছিলেন যে আমেরিকার সাণ্টা বারবারাতে মেয়েরা তাঁকে দেখে হাসাহাসি করেছিল, কিন্তু তাদের লাবণ্য ও স্বচ্ছন্দ চলন-ভঙ্গিমার প্রশংসা করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। "আমার সত্যি ভারি বেদনা হয় যখন তোমাদের স্বভাবে যা কিছু বিদেশী তা যদি তোমাদের নিজেদের জিনিষের চেয়ে ভালও হয়, তবু তার প্রতি তোমাদের এমন বিরুদ্ধতা দেখি।"

বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ শুধু সম্মান নয় যথেষ্ট বিরুদ্ধতাও পেয়েছেন। এমন কি আমেরিকার শুল্ক বিভাগের এক উদ্ধত নিরেট কর্মচারী তাঁকে একদা জিজ্ঞেস করেছিল তিনি লেখাপড়া আদৌ জানেন কিনা। এই ঘটনাটির উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ এনড্রুজ সাহেবকে এক চিঠিতে লেখেন :

"In the meantime their newspapers are hilariously impressed by this figure of an Oriental mystic coming

out of the railway train and also down from his c of introspection, to the mundane world, dressed in robe and blue socks, graciously posing himself photographed. Yesterday I gave a lecture to group of students and some of them sat mopping faces with powder puffs and some at the end c shake hands with me. The President benignly had a photograph taken later of a group compos Oriental fool and a member of the Nordic ra always minds his own purpose while the cost is others less favoured by fortune.···This is a fit which had its first act in the Immigration Vancouver." (লস এন্‌জেল্‌স্‌, ২০ এপ্রিল,-১৯২৯)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মের এক শ বছর পরে তাঁর যে প্রতিমূর্তি প্রতিভাত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে এক বিরাট মানবের। এই অনেকখানি পরিচয় যা আমাদের অজানা ছিল তা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে দেবীর বইতে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ও রবীন্দ্রনাথের মুখের কথার বহু উ লেখিকাকে এগুলি সংগ্রহ করতে হয়েছে প্রভূত আয়াস করে। সার্থক হয়েছে।

ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ইও আমেরিকায় বিস্তৃত হয় ঝড়ের বেগে। কিন্তু বিশ্বসভায় কবি করে তিনি ক্রমশ হয়ে উঠলেন দার্শনিক, প্রফেট, মিষ্টিক। এজরা পাউণ্ড দুঃখ করে লিখেছিলেন: "আমার কাছে অব দুর্বোধ্য রহস্য রয়েই গেল যে, কেন এই দ্বীপবাসী সৎ লোকে একজন পরম শিল্পীকে শুধু তিনি শিল্পী বলেই সম্মান দেখাতে কেন যে তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য তাঁর জীবনকে তুলোয় মুড়ে প্রতীকরূপে ধ্বজা তুলে নিয়ে বেড়াতে হয়!" (মৈত্রেয়ী দেবীর অনু

কিন্তু এই অঘটনের জন্যে রবীন্দ্রনাথই কি অনেকটা দায়ী নন পাঠকরা তখন উন্মুখ হয়েছিল তাঁর বই পড়ার জন্যে। তাদে আর প্রকাশকদের তাগিদের চাপে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর ক

নাটকের অনুবাদ একটির পর একটি প্রকাশকদের জুগিয়েছিলেন তাতে তাঁর নিজের রচনার প্রতি সুবিচার করা মোটেই সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এ তো জানা কথা যে কবিতার অনুবাদ অসাধ্য। ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ যদি অসাধ্যসাধন করে থাকেন তার কারণ ইংরেজি গদ্যে ঐ গানগুলিকে তিনি একেবারে নতুন সাজে সাজিয়ে বিশ্বসভায় উপহার দিয়েছিলেন। তারপর ফরাসী শিল্পী জিদ্‌-এর হাতে পড়ে ঐ কবিতাগুলিরই ঘটল আশ্চর্য রূপান্তর। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। যে কবিকে বাঙালি জানে অন্তরঙ্গভাবে, অবাঙালি ভারতবাসী বা বিদেশবাসী তাঁর কতটুকু পরিচয় পেয়েছে?

স্বভাবতই আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে, তাহলে এক অখ্যাত বাঙালি কবিকে ঘিরে ইওরোপ আমেরিকায় এক অভূতপূর্ব ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হলো কি কারণে? মৈত্রেয়ী দেবী এই প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামিয়েছেন মনে হয় না, কিন্তু অ্যারন্‌সন্‌ তা করেছেন। তিনি বলছেন রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন কারণে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেছিল: "Every-one of them had his own axe to grind, and Rabindranath became a useful and innocent tool which they knew how to handle for their own ulterior purposes. So it came about that he was unknowingly made to represent certain tendencies in the party-politics of various nations, that his name was freely used for the sake of either appeasing or inflaming national hatred; the various religious and pseudo-racial denominations used him for their own ends; the litterateurs were often uncritical and unnecessarily con-descending..."

অবশ্য বিদেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে দু-চারজন রবীন্দ্রনাথের কণামাত্র পরিচয় পেয়েও তাঁর কাব্য বুঝতে পেরেছিলেন অতি আশ্চর্যভাবে, যেমন, ইয়েট্‌স্‌, পাউণ্ড, জিদ্‌, ফসেট ("No poet has had a more constant sense of the wonder of the created world."), এমন কি বহুনিন্দিত এডওয়ার্ড টম্‌সন্‌, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁর প্রতি সমূহ অবিচার করেছিলেন ও মৈত্রেয়ী দেবী যাঁর নাম উল্লেখ করেছেন নির্বিচার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে।

কিন্তু এই বিজাতীয় ঘূর্ণাবর্তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লক্ষ্যভ্রষ্ট হন 'ডাকঘর' রচনার সময়ে তিনি অন্তরে যে ডাক শুনেছিলেন, "যাবার তোমাকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে—যেখানকার মানুষের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে"—তা ক্রমশ প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, বর্তমান যুগের মহত্তম ঘটনা পশ্চিমের মিলন। এই মিলনের অন্তরায় তিনি যখনই দেখেছেন তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তার চরম দৃষ্টান্ত 'সভ্যতার সংকট'। পঁচিশ বছর আগে জাপানে ও আমেরিকায় তিনি সাম্রাজ্যবাদের কুৎসিৎ রূপ উদ্ঘাটন করে বক্তৃতা দেন 'ন্যাশনালিজম্' বা জাতীয়তার বিরুদ্ধে। এ তো অতি স্পষ্ট কথা (অবশ্য মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে না) ন্যাশনালিজম্ বলতে তিনি বুঝেছিলেন অংশত ইম্পিরিয়ালিজম্ অংশত রাষ্ট্রের যান্ত্রিক শাসন যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে একেবারে করে দেয়। কিন্তু তিনিই আবার দশ বছর পরে কি করে মুসোলিনি কুহকে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। 'পার্সন্যালিটি', 'রিলিজিয়ন্ অফ্ ম্যান্' প্রভৃতি একটির পর একটি ইংরেজি গদ্যগ্রন্থ বইতেও তিনি জয়গান করেছেন মানুষের ব্যক্তিত্বের। এই সব মধ্যে মূর্ত হয়েছে যে মহৎ সংবেদনশীল মন পাশ্চাত্ত্য জগৎ যদি মুগ্ধ হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু তা নয়, আমাদের মনে রাখতে হবে যে পশ্চিমের প্রাণবান জগতের না এলে রবীন্দ্রনাথের মনে এতটা সাড়া জাগত না। আর এই প্রাণ জগতের একটি অংশ সোভিয়েত রাশিয়াকে রবীন্দ্রনাথ কি চোখে দেখেছি সে তো জানা কথা।

কিন্তু 'ন্যাশনালিজম্' ছাড়া অন্যান্য ইংরেজি গদ্য রচনায় রবীন্দ্র যে পরিচয় পাওয়া যায় তা প্রায় শুধু অধ্যাত্মসাধক রবীন্দ্রনাথের। শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রাষ্ট্র সামাজিক প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ—যা প্রকাশিত হয়েছে 'দ্য ইউনিভার্সাল ম্যান' নামে—ইংরেজিভাষী জগৎকে একটু চমক লাগিয়েছে মনে কেননা এই বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'দ্য টাইমস্ লিটারারি সাপ্লিমেন্ট' লিখেছিলেন: "এতদিন রবীন্দ্রনাথকে আমরা জানতাম শুধু মিষ্টিক কিন্তু এই প্রবন্ধগুলি পড়ে জানা গেল তিনি ছিলেন সংগ্রামশীল আদর্শবাদী

(embattled idealist), কেননা চিরজীবন তিনি কুশাসন ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন।"

এ কথায় আমরা গৌরব বোধ করব নিশ্চয়। কিন্তু তবু আমরা বলব রবীন্দ্রনাথ ইওরোপকে দিয়েছেন "অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি"। তাই ইওরোপে তাঁর কবিযশ এত অল্পদিনে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বিশেষ বন্ধু স্টার্জ মুর ১৯৩৫ সালে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন:

> "Immediately after the war there had been a violent reaction towards hope and generosity but it was short-lived and people are no longer thirsty for spirituality and beauty, but relish cynicism, pessimism and mechanical cruelty. Just as your work fed the first reaction, it now seems tasteless to the second···You have had a myriad lovers in your lifetime and I make no doubt will have a myriad more who, though of a more trustworthy character, will never fill their eyes with your bodily presence. So you are one of the luckiest poets."

এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্টার্জ মুরকে লেখেন:

> "Only I feel like a departing guest at a weary ceremony of farewell, when the railway train which is to take him away makes an unaccountable delay inspite of repeated whistles."

এই মর্মস্পর্শী চিঠির তারিখ ২০ জুন, ১৯১৫ সাল।

রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁর এক বিদেশী বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমার মধ্যে তোমরা কি দেখেছ? এক বছর আগে শতবার্ষিকী উৎসবের সময়ে বিশ্বসভায় বহুজনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাম। বহু বাঙালির মনেই হয়তো এই প্রশ্ন জাগবে, পৃথিবীর সর্বদেশের লোক আজ যে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করছে, সে কি আমাদের রবীন্দ্রনাথ?

রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার ঘোষের উক্ত নামীয় সমালোচনা-গ্র
রবীন্দ্রকাব্য ব্যাখ্যানে একটি নতুন ও উল্লেখযোগ্য সংযোজন*। সাম্প্রতি
কালের একজাতীয় পণ্ডিতম্মন্য বিমূঢ়তায় পাশ্চাত্ত্যের প্রেক্ষাভূমির আ
চমকলাগানো রবীন্দ্র-বিদূষণ, অন্যদিকে বহুলভাষিতের ক্লান্তিকর পুনরুক্তি
চিরাচরিত স্তবন—এই দুই পথকেই সম্পূর্ণ পরিহার করে শ্রীযুক্ত ঘোষ
বইতে সুস্পষ্ট চিন্তা ও সুতীক্ষ্ণ ভাষণের যে মৌলিকতা দেখিয়েছেন,
অভিনন্দনযোগ্য। এই গ্রন্থের কোনো কোনো আলোচনা ধারাবাহিকভা
'অনুক্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময় ব্যক্তিগতভাবে যে কৌতূহল
করেছিলাম, সমগ্র বইটি হাতে আসায় সেটি চরিতার্থ হওয়ার সু
ঘটল।

'পুনশ্চ' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত বইটির পরিক্রমা। লেখকের
"সব মিলিয়ে এই সময়কার লেখায় দুর্বল কবিতারাই দলে ভারী।"
প্রধান কারণ "অপরিসীম দ্বন্দ্ব ও দ্বৈধতা, বহুমুখিতা।" এই
মীমাংসা সামান্যই হয়েছে, দ্বৈধতার নিরসন ঘটে নি এবং বহুমুখিতা এ
অখণ্ড ভাব পরিমণ্ডলে সমন্বিত হতে পারে নি। "সমগ্র উত্তরকাব্য
আমরা যদি একটি কবিতা বলে গ্রহণ করি তা হলে মনে হয় এটি যেন এ
ব্যস্ত বিশৃঙ্খলার সময়, সম্যক দৃষ্টি পাওয়ার আগেকার তটস্থ অবস্থায়
মানবীয় খণ্ড-কবিতা।"

অধ্যাপক ঘোষ এই আলোচনায় তিনটি জিনিসের ওপর প্রধা
জোর দিয়েছেন বলে মনে হলো। প্রথমত গদ্য ছন্দ—যার সাহায্যে রবীন্দ্র
বাস্তবভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে ব্রাত্যজনের ভাষা ও জীবনের সন্নিহিত
অভীপ্সা প্রকাশ করেছেন—তার বিচার; দ্বিতীয়ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব
যুদ্ধকালীন পর্যায়ে কিছু কিছু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে "দিন বদলের পালা"
কথা বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতাকে যে ধিক্কার হেনেছেন ও গণতান্ত্রি
শিবিরে সামিল হওয়ার যে সঙ্কেত দিয়েছেন তার সততা নিরূপ
তৃতীয়ত "ধূসর জীবনের গোধূলি"তে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিচৈতন্যকে বিশ্বচেতনা
বিলীন করে দেবার যে নির্মোহ প্রশান্তি অথচ সেই সঙ্গে জীবনে

* রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য॥ শিশিরকুমার ঘোষ। মিত্রালয়। আট টাকা॥

"রূপনারাণের" কূলে সুন্দরী পৃথিবীর উদ্দেশে যে প্রীতিনিবিড় অঞ্জলি রচনা—কবির সেই করুণ-সুন্দর মানসদ্বিধার বিশ্লেষণ। আরো কিছু কিছু বক্তব্য অবশ্যই আছে, কিন্তু মূলত এই ত্রিকোণ-ভূমিতেই 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য' স্থাপিত হয়েছে।

যদিচ পূর্ববর্তী সমস্ত সমালোচক ও ব্যাখ্যাকারদের সমগ্র মতামতই লেখক যথোচিত শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবন করেছেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য), তথাপি তিনি কোথাও প্রভাবিত হন নি। তিনি বহু অভিমত ও মতবিরোধের মধ্য থেকে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তগুলিকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন। তাঁর কোনো কোনো সিদ্ধান্ত অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণ—কখনো কখনো বিতর্কের তীব্র উত্তেজনাকে সংযত করা কঠিন হয়। অধ্যাপক ঘোষ আমাদের চিন্তা ও প্রত্যয়কে বার বার আন্দোলিত করতে পেরেছেন, বর্ণহীন, অন্তঃসারবর্জিত, নিছক বাক্‌চাতুর্য ও অলঙ্কৃত ভাষার উপদ্রবে জর্জরিত সমালোচনা-গ্রন্থের ভিড়ের মধ্যে তাঁর বইখানির এইটিই সর্বাধিক কৃতিত্ব।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য ছন্দ সম্পর্কে তাঁর আলোচনা ভাবাবার মতো। এই বিশেষ শিল্পরীতিটি কি শিল্পিমনের স্বাভাবিক ঋতুপরিবর্তনের ফসল অথবা নিছক একটা আঙ্গিকগত পরীক্ষামাত্র? অধ্যাপক ঘোষ দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী এবং এই নবকাব্যরীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে প্রত্যাশার কথা ঘোষণা করেছিলেন (অর্থাৎ কাব্যের ভাষাকে আটপৌরে সাজে সাজিয়ে তার বক্তব্যকে জনসন্নিহিত করা), সেটিও সমুচিতভাবে সিদ্ধ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। আসলে "সমাজের উচ্চমঞ্চে" এবং "সংকীর্ণ বাতায়নে" সমাসীন—মানসধর্মে চড়া রোমান্টিক কবি, ইচ্ছার পূর্ণ সততাসত্ত্বেও যে "ব্রাত্য" হতে পারেন না, এই কবিতাগুলি তারই নিরিখ। আর এই কারণেই কিছুটা কৃত্রিম এই কাব্যরীতি রবীন্দ্রনাথের উত্তরতর কালে প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে।

এই মতের খানিকটা সাপেক্ষতা করেও গদ্য ছন্দের কাব্যগত সাফল্য-অসাফল্যবিচারে অধ্যাপক ঘোষের সিদ্ধান্ত সবখানি মেনে নেওয়া কঠিন। "ব্রাত্য এবং মন্ত্রহীন" হওয়ার পদক্ষেপহিসেবে এর সার্থকতা যা-ই থাক, প্রকাশের ব্যাপ্তি ও শক্তির দিক থেকে গদ্য ছন্দের মূল্য সীমাহীন। কিছু কিছু কাহিনীমুখ্য কবিতা ('লিপিকা'য় যার সূচনা) এই রীতিতেই সম্পূর্ণ বিকশিত হতে পেরেছে বলে মনে হয়। গদ্য ছন্দের মূল্যবিচার বিস্তৃত এবং গভীরতর পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

'নবজাতক' বা 'জন্মদিন'-এর যে-সব কবিতায় যুগ-সমস্যার ছায়াপাত ঘটেছে, যে-সব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদ বা শোষণতন্ত্রকে ধিক্কার দিয়েছেন, অথবা যে-সব ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্কেত আছে, সেগুলির আলোচনায় গ্রন্থকারের উত্তেজনা একটু অহেতুক মনে

হয়। দু-একটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধে অথবা আংশিক বিচারে যা-ই বলা হোক রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে যাঁর কিছুমাত্র ধারণা আছে, তিনি কখনোই রবীন্দ্রনাথকে 'গণকবি' প্রমাণ করবার মূঢ়তার আশ্রয় নেবেন না। স্বদেশী যুগের সঙ্গীতেও যিনি শুনিয়েছেন, "তোমার হাতে নেই ভুবনের ভার" এবং "হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার"—সর্বসংকটের মধ্যে যিনি ঐশ্বরিকতার হাতেই চিরকাল পরম সমাধানের ভার ন্যস্ত করেছেন; যিনি 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার অন্ন-বস্ত্র-জীবিকার বাস্তব দাবিকে শেষপর্যন্ত অধ্যাত্ম-'Manna'য় নিবৃত্ত করেছেন—তাঁর বক্তব্য পূর্বাপর অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট। 'শিশুতীর্থ' কবিতায় আর কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন তিনি? 'প্রায়শ্চিত্ত'-এ "কল্যাণশক্তি"র উপরেই তিনি একান্ত নির্ভর জানাতেন এই তো স্বাভাবিক সত্য। রবীন্দ্রনাথকে যিনি ধারাবাহিক ভাবে অনুসরণ করবেন, তিনি কখনোই কবিকে উত্তরজীবনে 'জনগণেশের অধিনেতা'র শিরোপা দিয়ে বিব্রত করবেন না।

রবীন্দ্রনাথ 'গণকবি' হয়েছেন কি হন নি, এ আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু যুগের সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে তিনি সমর্থন করেছেন, তাঁর নিজের জীবনবোধ অনুযায়ী তাদের মূল্যবিচার করেছেন এবং ব্যক্তিবৃত্তের সীমা রক্ষা করে যথাসাধ্য নতুন চিন্তা ও আন্দোলনের শরিক হয়েছেন এইটেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা। এই মহত্ত্বেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাথার মণি। সমগ্রভাবে তাঁর জীবনদৃষ্টিকে স্মরণ রাখলে একথা অকারণ ক্রোধোক্তির মতোই মনে হয়: "রবীন্দ্রনাথ যতক্ষণ অনৈতিহাসিক ততক্ষণই রবীন্দ্রনাথ। ইতিহাসের সামনাসামনি হলেই তিনি বিভ্রান্ত; নৈতিকতা, অলৌকিকতা, অযৌক্তিকতার আড়ালে আশ্রয়প্রার্থী।" "শ্যাম বনবীথি পাখিদের নীতি সার্থক হোক পুন"—এই সমাধানেই বা ক্ষোভের কী কারণ থাকতে পারে? 'রক্তকরবী' নাটক যেখানে শেষ হয়, সেখানে 'শ্রমিক রাজ' প্রতিষ্ঠা হয়েছে এমন সিদ্ধান্তে কি কোনো সুস্থচিত্ত পাঠক উপনীত হন? আদিম কৃষি-সভ্যতার একটি রোমান্টিক পুনরুজ্জীবনই 'রক্তকরবী'র শেষ স্বপ্ন। ইতিহাস কিংবা যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করি আর না-ই করি, এ-ই রবীন্দ্রনাথ—এর বেশি অহেতুক দাবি কেন করা! অন্যত্র দেখছি, "মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারক" ইত্যাদি বিখ্যাত পংক্তিগুলি তুলে সমালোচক ব্যঙ্গ করে বলছেন: "'বজ্রবাণী'তে ধিক্কার জানানোতে কি কবিতর্তব্য সমাপ্ত? এই ধিক্কার কি স্বয়ং বক্তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে না?" নিশ্চয় করে এবং আত্মসমালোচনাতে রবীন্দ্রনাথ কখনোই কুণ্ঠিত নন—এই বইতেই লেখক তার ভূরিপ্রমাণ উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু বজ্রগর্জিত ধিক্কার ছাড়া কবির কাছে আর কি প্রত্যাশা রাখেন সমালোচক? রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে দেখেও তিনি বৃদ্ধ কবির কবিতায় কি একটি রাজনীতিক কর্মকাণ্ডের সুদীর্ঘ তালিকা

পেতে চান? "যাহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং বেগুন না পাইলে ধানকে শস্যের মধ্যে গণ্যই করেন না"—তাঁদের মনঃক্ষোভ এই পরিশ্রমসিদ্ধ বুদ্ধিদীপ্ত বইখানির মধ্যে না থাকলেই ভালো লাগত।

সমালোচক জানিয়েছেন, তিনি ইচ্ছা করেই রবীন্দ্রনাথের পূর্বপর্যায়ের কবিতার পরিক্রমা বর্জন করেছেন। হয়তো একটি নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে বলেই তাঁর এই সংকল্প। কিন্তু এই 'watertight compartment'-এর দরজা একটু খুলে দিলে ক্ষতি ছিল না—কারণ রবীন্দ্রনাথের উত্তর-কবিতা স্বয়ম্ভূ নয়, তার একটা ঐতিহাসিক বিবর্তন আছে এবং সেই বিবর্তনের ধারার প্রতি লক্ষ্য রাখলে আলোচনা আরো স্পষ্টরেখ হতে পারত।

লেখক রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন—সেগুলি সম্পর্কেও মতভেদ অপরিহার্য। কতগুলি দ্রুত মন্তব্যের তাৎপর্য বোঝা গেল না। 'নারীস্তব'-এর প্রসঙ্গে কয়েকটি দুর্বল কবিতার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'পুকুর ধারে', 'তেঁতুলের ফুল'—"অবান্তরতার উদাহরণ"। কেন "অবান্তর"? ভাদ্রমাসের কানায় কানায় ভরা পুকুরটিকে দেখতে দেখতে, "বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা" যদি অনুষঙ্গে একটি স্মৃতি নিয়ে এসেই থাকে, তাকে অবান্তর কেন বলব? কবিতার সংহতি এতে নষ্ট হয়েছে বলে তো মনে হয় না। 'তেঁতুলের ফুল'-এ যে বন্য-ব্রাত্য চেতনাকে কবি লক্ষ্য করেছেন, তাঁর গদ্যকবিতার পর্বে সেই ফুলের মঞ্জরী যদি নতুন করে তিনি নায়িকাকে পরিয়ে দেন, তা হলে গদ্যকবিতা সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতি সার্থকভাবেই তিনি পালন করেছেন, লেখকের যুক্তিধারা অনুসারে সেই সিদ্ধান্তে আসাই তো সমীচীন! মন্তব্যের আকস্মিকতা যুক্তিনিয়ন্ত্রিত না হলে প্রায়ই তা নিরাপদ নয়।

অধ্যাপক ঘোষ এই বইখানি সম্পর্কে যে আশা পোষণ করেছেন তা সফল হবে। অর্থাৎ তাঁর মৌলিকতা, সন্ধিৎসা এবং বক্তব্যের তীক্ষ্ণ স্পষ্টতা পাঠককে ভাবাবে এবং বিতর্কের উদ্বোধন ঘটাবে। সেই সঙ্গে মনে হবে, রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যের সম্পর্কে এখনো অনেক আলোচনা, অনেক পুনর্বিচারের প্রয়োজন আছে। এই কারণেই লেখক ধন্যবাদভাজন।

রবীন্দ্র অভিধান

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

'রবীন্দ্র অভিধান'-এর প্রথম খণ্ড যখন গত বছরে প্রকাশিত হয়, তখনই 'পরিচয়'-এ এই মহৎ উদ্যোগকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল (শ্রাবণ, ১৩৬৮)। সম্প্রতি দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে।* এ জাতীয় গ্রন্থের উপযোগিতা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। যেহেতু এই পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণ বক্তব্য গতবারেই উপস্থিত করা হয়েছে, সেই হেতু তার বিশদ পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। বরং দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে এখানে দু-একটি কথা নিবেদন করি।

১ প্রথম বক্তব্য আকার প্রসঙ্গে। এত বিস্তৃত ব্যাখ্যা কেন? শুধু ব্যাখ্যা নয়, অনেক কবিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে সুবিস্তৃত সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছেন অভিধানকার। অভিধানের উদ্দেশ্য তো নিশ্চয়ই সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের সংক্ষেপীকরণ নয়। অভিধান তথ্যের (এবং হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে তত্ত্বের) সঙ্কেতবাহী মাত্র। কিন্তু সোমেনবাবু এ কথাটা সব সময় মনে রাখেন নি। ফলে 'আগমনী'-র মতো কবিতার (প্রথম লাইন: "অম্বর নদীতীরে"...ইত্যাদি) জন্যে তিনি বরাদ্দ করেছেন পৌণে এক কলাম, এবং চার লাইন উদ্ধৃতিসহ একটি সংক্ষিপ্তসারও দিয়েছেন। এর প্রয়োজন ছিল না। "আগুনে হল আগুনময়" ('অরূপরতন') গানটি কোন প্রসঙ্গে গাওয়া হয়েছে তা বর্ণিত হয়েছে চোদ্দ লাইনে (কলাম)। এতখানি বিস্তৃতি এ গানের প্রসঙ্গটুকুর প্রাপ্য নয়। এ রকম উদাহরণ আরো অনেক আছে।

'অ' এবং 'আ'-তে দুটি খণ্ড হয়েছে। সম্পূর্ণ হলে এর আকার সহজেই অনুমেয়। 'রবিরশ্মি' (যা রবীন্দ্র অভিধানের তুলনায় খুবই ক্ষীণ) প্রণেতা চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন সে-কথা স্মরণযোগ্য। "তুমি আমার প্রত্যেক কবিতাটি নিয়ে ব্যাখ্যা করে চলেছ, তাতে আমি গৌর বোধ করি। কিন্তু একটা কথা এই মনে হয়, কাব্যরস আস্বাদনে পাঠকদের অত্যন্ত বেশী যত্নে পথ দেখিয়ে চলা স্বাস্থ্যকর নয়।"

২ কবিতা সম্পর্কে মতামত দেওয়া অভিধানকারের সীমা-বহির্ভূত। কিন্তু "আজি এ ভারত লজ্জিত হে" গানটির ক্ষেত্রে "রবীন্দ্রনাথের যে ক' কয়েকটি গান কৃত্রিমতার ভারে আড়ষ্ট, যার ভাষা নিতান্তই চেষ্টাকৃত এ

---

* রবীন্দ্র অভিধান (দ্বিতীয় খণ্ড)॥ সোমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যাণ্ড। ছয় টাকা॥

গানটি তাদের অন্যতম।"—এই উক্তি সোমেনবাবু করেছেন। তাঁর এই উক্তি সঠিক কিনা এ বিষয়ে বিতর্ক তুলছি না; কিন্তু অভিধানকারের মত অভিধানে না আসাই উচিৎ।

৩ এই মত প্রকাশের ব্যাপারেই উল্লেখ করা যায় 'অপঘাত'-প্রসঙ্গটি। এ বিষয়টা সোমেনবাবুর অবসেসনের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃতি-সহ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন এই লাইন ক-টি:

"টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হলো
সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।"

দ্বিতীয় খণ্ডে 'আত্মছলনা'-প্রসঙ্গে ('অপঘাত' ও 'আত্মছলনা' এক তারিখে লিখিত।) পুনরায় এ লাইনগুলি উদ্ধার করেছেন। এক তারিখে লিখিত—এ ছাড়া দুই কবিতার আর কোনো সংযোগ নেই। 'আত্মছলনা' একটি প্রেমের কবিতা। সোমেনবাবু নিজেও স্বীকার করেছেন যে রাজনৈতিক কোনো ঘটনার ছায়া নেই এ কবিতায়। তবু তিনি এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত রাজনৈতিক আলোচনা করেছেন। 'অপঘাত'-এর ঐ লাইন তিনটির আগে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সাত দিন আগে লিখিত 'অভিশাপ' কবিতার দুটি পংক্তি:

"সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো
দেশবিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত"

তাতে এই ধারণা হওয়া পাঠকের পক্ষে অসঙ্গত নয় যে এই লাইন দু-টিও সোভিয়েত সম্পর্কেই বলা।

এর পরে এই খণ্ডেরই অন্যত্র বিখ্যাত 'আফ্রিকা' কবিতার আলোচনায় "এই দানবীয় আক্রমণ"-এর কথা উল্লেখ করেছেন কবিতাটির রচনার সময়ের আন্তর্জাতিক পটভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে।

ফিনল্যাণ্ড-বোমাবর্ষণের ঘটনাটি সমগ্র রাজনৈতিক ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এতবার পরিবেশন করায় সাধারণ পাঠকের মনে রাশিয়া-বিদ্বেষ জাগা খুবই স্বাভাবিক এবং তার চেয়েও বড় কথা, ফলে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া-সম্পর্কিত মতামতও বেঠিকভাবে উপস্থিত হলো।

পরবর্তী কোনো খণ্ডে যদি তিনি এই ঘটনার পুনরুল্লেখ করেন (যা 'রাশিয়ার চিঠি' প্রসঙ্গে করা স্বাভাবিক), তবে সোমেনবাবুর উচিত দু-টি বিষয় পূর্ণ আকারে দেওয়া: (ক) ফিনল্যাণ্ড-বোমাবর্ষণের পূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাটি, (খ) রাশিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ মত।

৪ 'আমেদাবাদ' শীর্ষক অংশ সঙ্গত কারণেই আড়াই কলাম দীর্ঘ। আমেদাবাদে রচিত "আঁধার শাখা উজল করি" গানটিও এই খণ্ডের অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। সেই সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। "বলি ও আমার গোলাপবালা" ও "শুন নলিনী খোলো গো আঁখি"—গান-দুটিও এখানে রচিত। তারও কথা বলা আছে। কিন্তু এই গানগুলির

অন্তরালে যে নারীর প্রেরণা কাজ করেছিল, সেই আন্না তড়খড়ের নামোল্লেখ নেই।

'আ'-খণ্ডে আন্না তড়খড়ের আলোচনা স্বতন্ত্রভাবেও বাঞ্ছনীয়। আন্না তড়খড়ের নামই নেই 'আ'-খণ্ডে।

৫ ঠিক এই জাতীয় কথা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো প্রসঙ্গেও বলা যায়। "আরো একবার যদি পারি"শীর্ষক আলোচনায় ভিক্টোরিয়া-প্রসঙ্গ আর একটু আসতে পারত। বিশেষ করে শ্রীমতী ওকাম্পো (একাডেমী ভল্যুম) ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ ('দেশ', সাহিত্য সংখ্যা) প্রকাশিত হবার পর প্রয়োজন আরো বেড়ে গেছে। অবশ্য 'ভিক্টোরিয়া' বা 'পূরবী' প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বলার সুযোগ আছে।

৬ অজিতকুমার চক্রবর্তীর শান্তিনিকেতন ত্যাগের কারণ হিসেবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য পুরো উদ্ধার করেছেন সোমেনবাবু। কিন্তু সোমেনবাবুরই লেখা ('সমকালীন'-এ প্রকাশিত) থেকে সচেতন হয়ে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সহধর্মিনী লাবণ্যলেখা চক্রবর্তী 'সমকালীন'-এ যে প্রবন্ধ ('অজিত চক্রবর্তী সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য', সমকালীন, ভাদ্র, ১৩৬৮) লিখেছিলেন তার উল্লেখ মাত্র করেছেন, তাঁর বক্তব্য এক বিন্দুও পাঠককে জানান নি। প্রভাতবাবু কারণ নির্দেশ করেছিলেন, "…অজিত কবি সম্বন্ধে বেশ একটু 'ক্রিটিক্যাল' হইতেছিলেন।…অজিতের মন নানা কারণের যোগে রবীন্দ্রনাথ হইতে সরিয়া আসিতেছিল ; কলিকাতার বৃহত্তর সাহিত্য সমাজের মধ্যে আত্মপ্রকাশের বিস্তৃততর ক্ষেত্র পাইবেন এ আশাও অন্যতম ছিল বলিয়া আমাদের ধারণা।"

শ্রীমতী চক্রবর্তী এর প্রতিবাদ করেন। বিভিন্ন তথ্য দিয়ে তিনি তখনকার পরিস্থিতিটি বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে বলেছেন, "কাজেই প্রভাতবাবুর ধারণা একেবারেই ভুল। তাঁহার উচিত রবীন্দ্রজীবনীর পরিশিষ্টে তাঁহার ভুল স্বীকার করিয়া ও আগাগোড়া অজিতবাবু সম্বন্ধে তাঁহার ভুল উক্তি সংশোধন করিয়া পুনরায় লেখা।"

প্রভাতকুমার কি করবেন তা তাঁর বিচার্য, কিন্তু অভিধানে আপাতত দুটি মতই থাকা উচিত ছিল।

৭ 'অ'-খণ্ডের মতো 'আ' খণ্ডেও 'লেখন'-এর ক্ষুদ্র কবিতাগুলি বাদ রয়েছে।

কিন্তু এ সব খুঁটিনাটি ত্রুটির কথা তুলতেও সঙ্কোচ হয়। একক উদ্যোগে যে বিরাট কাজে সোমেনবাবু হাত দিয়েছেন তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। আগামীকালের অগণ্য পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন তিনি নিঃসন্দেহে। যে শ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে তিনি এ কাজ করছেন, তা তাঁর পরম-রবীন্দ্রপ্রীতির প্রমাণ। তাঁর রবীন্দ্রপ্রীতি ফাঁকা নয়, ফাঁপা নয়, নিখাদ ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে তিনি তার পরিচয় রাখছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের স্বার্থেই তাঁর এ প্রয়াসের সাফল্য কামনা করি।

কাঞ্চনজঙ্ঘা

দুটি চিন্তা

এক

সত্যজিৎ রায়ের অম্বিষ্ট বিষয়ে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' আমাদের মনে আশা জাগিয়েছে। এতাবৎকাল তিনি যতগুলো ছবি করেছেন, তাতে চোখ ও কানকে তৃপ্তি দেবার মতো প্রচুর উপকরণ ছড়িয়ে থাকত ; বিচিত্র মুখ, নানাছাঁদের দেহ, একটা টুকরো থেকে আর একটা টুকরো ছবিতে যাবার নিপুণ কৌশল, চোখের নিয়মে কোনো কোনো বস্তু বা নিয়মের সংস্থান, কাটা কাটা কথা, চকিতে অর্থবান ইঙ্গিত আর বাইরে থেকে আসা শব্দের চমক। আমাদের অতি পরিচিত এই তৎপরতা ও কৌশল নিশ্চয়ই অভাবনীয় সম্ভাবনার সূচনা করেছে, কখনও মনে হয়েছে চলচ্চিত্রের নিজস্ব নিয়মে এই বোধহয় পরিণতির রাস্তা। সত্যজিৎ রায় ক্যামেরা যন্ত্রের সঠিক ব্যবহারে তাঁর দক্ষ মনের পরিচয় দিচ্ছেন। ক্যামেরার ব্যবহার কথাটিও আমরা প্রথম চলচ্চিত্রে ওঁর কাছেই জানলাম। সঙ্গে সঙ্গেই দেখেছি কেমন তিনি সুন্দর কাহিনী বাছাই করেন। কাহিনী ও কৌশলের সংযোগে তিনি আমাদের এতদিনকার অভ্যাসে—চলচ্চিত্র নিছক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেই শেষ—রুচির নতুন চাপ আনেন, আমরা ভাবতে শিখি যে চলচ্চিত্র যতই আশ্রিত ও মিশ্রিত শিল্প হোক না কেন তার লক্ষ্য মানুষ ও সচেতনতা। নিছক প্রমোদ নয় ; মানুষকে দেখতে শেখাই, জীবনকে মূল্য দিতে জানাই শিল্পের শিক্ষা। কিন্তু এই সচেতনতার খোঁজে যেহেতু তিনি প্রায় পুরোটাই নির্ভর করেন চোখ ও কানের ওপর, শিল্পের আশা মেটে না। চোখ ও কান প্রকৃতি যতটুকু দেয় ততটুকুতেই খুশি, তার বেশি তাকে পৌছতে হলে হৃদয় ও মাথার আশ্রয় নিতে হয়। সত্যজিৎ রায় মানুষ পেতে চাচ্ছেন হৃদয় ও মাথা বাদ দিয়েই। মানুষ তো আমরা সবাই, আবার মানুষও নই। এই মানুষ ও অমানুষের দ্বন্দ্ব চলছে যেমন বাইরে বিশ্বপ্রকৃতিতে তেমনি আমাদের মনেও। তাই কোনো একটি মুহূর্তে কেউ শেষ বলে দিতে পারিনে—যা জানি তা চিরকালের মতো জানা, আর জানবার প্রয়োজন নেই, বা আমরাই পুরো মানুষ। শিল্পী তাই বারবার তাঁর চৈতন্যের আলো ফেলেন পাত্র-পাত্রীর মনে, দেখেন কতটুকু তারা হচ্ছে বা হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না বা কখন হচ্ছে। সুতরাং শিল্পীর সবটাই তাঁর জ্ঞান, বোধ ও মমতায়। ওঁর পুরনো ছবিতে চোখ, কানের পথেই যতবার মানুষগুলোর কাছাকাছি আসি, ভাবি এবার হয়তো আশ্চর্য করে দেবেন তাদের গভীর সত্য জানিয়ে, দেখি তিনি রহস্যের ঢাকা খুলতে না খুলতেই কেমন ছেড়ে দিচ্ছেন জানবার সব বাসনাটুকু। অন্তর্লোকে উঁকি দিয়েই সরে আসছেন প্রমাণসই জানালোকগুলোর অভ্যাসিকতায়।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা' কাহিনীর লৌকিক অংশটুকু হলো রায়বাহাদুর ইন্দ্রনা পরিবারকে ঘিরে। একটি নষ্টছেলে, ভীরু আত্মসমর্পিত স্ত্রী, মৃতদার পাণি প্রেমিক শ্যালক, বড় মেয়ে অনিমা, তার জুয়াড়ী স্বামী ও বাচ্চা টুকলু আর গুণী ছোট মেয়ে মনীষা। ওদের বৃত্তের টানে টানে আছে কৃতী ইন্‌জিনিয়া প্রণব, সাধারণ ছেলে অশোক ও একটি পাহাড়ী বালক। অলৌকিক অং হিমালয় ও কাঞ্চনজঙ্ঘা। হিমালয়ের অলৌকিক আবির্ভাবের পরিমণ্ড একটি বিবাহ প্রস্তাবের সম্ভাবনায় সমগ্র পরিবারটি পাহাড়ের শেষ বিকে পথে বেরোয়। পথেই সব অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে থাকে। প্রণবের বিবা প্রস্তাব করা হয়ে ওঠে না, তার বদলে সে একটি জাগতিক পরিকল্প জানায়। মনীষা যেন শিকারীর জাল থেকে চকিত ছাড়া পেয়ে স্বস্তি নিশ্বাস ফেলে, অশোকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সেতুতে অনাগত সম্ভাবনার স্ব দেখে। জুয়াড়ী শশাঙ্ক ও পরকীয়া প্রেমে মত্ত অণিমা সন্তান টুকলুর মায়া আবার নতুন সংসারের আশা গড়ে। মা লাবণ্য স্বামীর বিরুদ্ধে অন্ত একবার দাঁড়াবার ভরসা পায়। পুত্র অনিল ভেসেই বেড়ায়। শ্যালক লাব মনীষা-অশোকের নতুন পরিস্থিতিতে বোধকরি পারমাণবিক সংঘটনে বাইরে মনুষ্যত্বের খোঁজ পায়, পাহাড়ী ছেলেটি প্রণবের পিছে পিছে ফাঁপ রোমাঞ্চের মিথ্যাকেই যেন ধরে দিতে চায়। আর রায়বাহাদুর যোগে কোনো একটি অজ্ঞাত কার্যকারণে তাঁর লৌহবন্ধনে ফাটল ধরেছে।

লৌকিক জীবন ও সংসারে যখন এমনতর সব অঘটন ঘটে গেছে, তখ মেঘাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা আত্মপ্রকাশ করে। অনেক দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের পা কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ঐ মানুষ-কটির দ্বিধা কাটিয়ে ওঠা মীমাংসার নিশ্চিতিকেই জানায়। কাঞ্চনজঙ্ঘাই নিশ্চিতি; পাহাড় অগোচ সমতলের খোলস ছাড়িয়ে মানুষগুলোকে তাদের হৃদয় দেখায়, পুরনো সং ভাবনা, চিন্তা সবকিছুকেই ওলটপালট করে। অন্তত একবারের জন্যে মানুষরা সত্য হয়, মুখোশগুলো তফাতে হঠে। টুকলুর প্রতীকী অভি ছাড়াই অশোকের ঘোষণায় সে কথা জানি, জানি লাবণ্যের বেদনা আকস্মিক বিদ্রোহের ভঙ্গিতে। এই দুই সত্য ও জগত: সমতলভূমি পাহাড়, পুরনো জীবন ও সদ্যোত্থিত চেতনা, হতাশা ও উদ্যম, অস্থিরতা সিদ্ধান্ত—সত্যজিৎ রায় গড়েন মেঘভারাক্রান্ত আকাশ ও কাঞ্চনজঙ্ঘা নির্মল প্রত্যক্ষতায়। টুকলু তো ইতিমধ্যেই মা-বাবাকে বেঁধে দিয়েছে।

কিছু এই ছবির কাহিনী ও ব্যাখ্যা নিতান্ত মামুলি, ছকে গাঁথা। সমাজতত্ত্বের বাঁধিগতের চালে ছবিটি চলে, কখনো গড়িয়ে গড়িয়ে মনীষা-প্রণবের সংলাপের মতো, কখনো হঠাৎ ত্বরায়, এক অংশ থেকে অন্য ছবিতে যাবার ধাক্কায়। সত্যজিৎ রায় পাহাড়ের পথে পথে বিচ্ছি অংশগুলো উপস্থিত করেন নিপুণতায়, কাহিনীর পরস্পর বিচ্ছিন্ন তারা কেমন চমৎকার কাছাকাছি এসে জুড়ে যায়। অথচ ইন্দ্রনাথে

সমস্যা বড়ই জানা: ধনীরা স্বভাবতই জামাই ধরার পরিকল্পনা করে, ছেলেটি যদি শুরুতেই হাজারী হয়; যেমন প্রণবের সঙ্গে কন্যা মনীষাকে ভিড়িয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ-পরিবার ওত পেতে থাকে কখন আসবে প্রস্তাবের স্বর্ণডিম্বটি। বড়লোকের কৃতী ছেলেরা আবার সাধারণতই রুচিহীন ছোবড়া; যেমন প্রণব নিখিলেশ-সন্দীপের নাম শোনে নি, যদিও পরিচালকের সামান্য করুণায় সে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী ব্রাউনিং-এর কিছু সংবাদ রাখে। যন্ত্রের সঙ্গে অশিক্ষার যোগ আমরা ধরে নিই বলেই সম্ভবত সে ইন্‌জিনীয়র। আর তার পাশে নিম্নবিত্ত সাধারণ ছেলেরা রুচির এক একটি পিণ্ড, যেমন শ্রীমান অশোক। এরা কেমন সহজে (যদিও পাহাড়ের প্রভাবের কথা আছে) চাকরি ছেড়ে দেয় বড়লোকের ইংরেজপ্রীতিতে, কেমন রবীন্দ্রনাথ জানালার ধারে কবিতা লিখতেন না বলে নিজের জ্ঞান রুচির পরিচয় রাখে, কেমন চমৎকারভাবে প্রণবের চকোলেট দেখানো ও প্রেয়সীর কানের চুল বিষয়ে উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি টুক্ করে নায়িকার মাকে প্রণাম করে শিক্ষায় বৈপরীত্য প্রকাশ করে। তা ছাড়াও এরা ইনিয়ে বিনিয়ে বড়লোকদের সমালোচনা করে, ঠোঁটে রঙ দরজায় কুকুর জানিয়ে দুই জগতের ফারাক বিষয়ে অভিমান জানায়। ফলে তখন সমাজতত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর নজীরে নায়িকা মুক্তির অবলম্বন পায় তাতে। অসংস্কৃত প্রায়-কণ্ঠরোধকারী প্রণবের হাত থেকে অশোকের বন্ধুতায় মনীষার স্বস্তি তৈরি হয়। আরো মজা এই বড়লোকের একমাত্র ছেলেকে মেয়েবাজ বখাটে হতেই হবে। এই সুন্দর সাজানো জগতে আত্মরতির অখণ্ড অবসর তাই অনিলের মেয়ে-ধরা, অশোক-মনীষার গোঁজামিল-সংযোগ আমাদের অক্ষমতায় আশাপূরণের মধুর স্বপ্ন আনে।

এই কথাগুলো ওঠে কারণ সমাজতত্ত্বের দৌলতে আমরা নির্দিষ্ট গড়পড়তা হিসেব হয়ে আছি। অথচ কখনো কখনো কেউ বুঝি, সংখ্যাতত্ত্বের গড় মানুষের মুখে আয়না তুলে ধরে না। প্রণব-অশোকের জগত ও রুচি কেন যে এমন হতেই হবে তার কার্যকারণ আমার জানা নেই। বাবার অকথিত চাপে মনীষা না-ভালোবেসেই প্রণবকে স্বীকার করতে বাধ্য হতে পারে কিন্তু তার জন্যে প্রণবকে রুচিহীন না-হলেও তো চলে! যদি মেনে নিই প্রণব কোনো সমাজের ইঙ্গিত দেয় না, সে একটি মাত্র মানুষ, তবে অবাক হতে হয় একথা ভেবে যে অশোকের পাশে প্রতিপক্ষে দাঁড় করাবার কত চেষ্টা, কত কৌশল না ছেয়ে আছে! আর অশোক, সে কি যে-কোনো একজন বলেই মনীষার সহচর, বন্ধু হয়ে ওঠে? না, অশোক বলেই? অশোককে আমি তো দেখি অতিসাধারণ, অসংস্কৃত, নিকৃষ্টরুচির বাচাল, লোভী একটি ছেলে। সে কেবল নানা ছুতোয় মনীষার চারপাশে ঘোরে, প্রণবকে ঈর্ষা করে মনে মনে আর সুযোগ পেলেই অভিমান জানায় মনীষার সঙ্গে তার কেমন দূরত্ব। আর আশ্চর্য এই ছেলেটির ভদ্রতা ও সংযম! বঙ্গবাসী কলেজের বি. এ. পাস এই যুবক কিন্তু ইন্দ্রনাথ নামক বড়লোক ইংরেজ-

প্রেমিক অথচ বৃদ্ধের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করে না, শেষ সাক্ষাতে "গুড ডে স্যার" বলে বিদ্রূপ করে যায়! মনাষার জগতে এই ছেলেটির প্রবেশাধিকার মেলে।

কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রভাব পড়ে হয়তো অনিমা-শঙ্করের কাহিনীতে। যদিও "পাহাড়ের কান নেই", তারা পাহাড়ের অলক্ষ্য চাপেই তাদের সমস্যা মেটাতে চায়। কিন্তু সত্যজিৎ রায় এমন খেলো, হাল্কা চালে ওদের বিরোধ ও সমাধান ধরেন যে মনে হয় ওরা বুঝি রোজকার একবাজি দাবা খেলে উঠল। জীবনে গভীরে রেখা না কেটে দাবায় যতটুকু বিরোধ ও বচসা থাকে ঠিক ততটুকুই ওরা ঝগড়া করে বা কাঁদে। শশাঙ্কর বীরত্ব ও হৃদয় পরিবর্তন প্রকাশ হয় পায়চারিতে, অনিমার সবজানা সংসারের বাসনাটি তখনকার মেয়েলী কান্নায়। এতদিনকার দীর্ঘ বুকচাপা বিরোধ ও যন্ত্রণা মধুর-পরিসমাপ্তির তৈরি খোলসে ঢোকে—মর্মান্তিক হানাহানির তীব্রতা ছাড়াই।

অশোকের ঘোষণা সত্ত্বেও পাহাড় ওর চরিত্র ছোঁয় না। একমাত্র বাচালতা ও বিকার ছাড়া ওর কোনো পরিবর্তন নেই। লাবণ্য ও মনীষার চরিত্রে একমাত্র শুদ্ধতার ছাপ আছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার অঘটনঘটনপটিয়সী ক্ষমতার ছাপ আছে। কিন্তু ছবির যুক্তিতে বা কার্যক্রমে তা পাহাড়ের উপস্থিতি ছাড়া ঘটতে পারত। কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়, প্রিয়তম কন্যার ছায়াঘন করুণ মুখশ্রী তাকে যন্ত্রণায় ঠেলে দিয়েছে বিদ্রোহে। অণিমার বঞ্চনা তো জানাই আর মা-র। আত্মসচেতনতার প্রথম উঁকিঝুঁকিতে চারপাশের নিরুদ্ধ ঘনায়মান চাপ, কখনো বাবার শব্দহীন শাসন ও অনুজ্ঞা, কখনো মা-র অসহায় আত্মসমর্পণ, দিদির খেয়ালী অথচ লোভের উৎসাহ, কখনো প্রণয়ের উপহারাদির নীরব কামনা—মনীষার সরল অন্তর্নির্ভর সুকুমার জীবনটিকে চকিতে অন্ধকার খাদের সামনে ঠেলে দিয়েছে। এ-ঘটনা যে-কোনো জগতেই ঘটতে পারত। তাই কাঞ্চনজঙ্ঘার টানে নয়, প্রণবের শেষ বক্তব্যে মনীষা মুক্তিকে দেখতে পায়।

বাকি তিনটি চরিত্র, মনীষার মামা, দাদা অনিল ও পাহাড়ী ছেলেটি সবই ছবি সাজাবার উপকরণ মাত্র—সত্যজিৎ রায়ের চোখকানের যুক্তিতে আসে। লৌকিক বা অলৌকিক কোনো অংশের সঙ্গেই এরা জড়িত নয় যেমন এ-ছবির রঙ। মানুষের সম্পর্কের টান, বিরোধ ও গভীরতা রঙে বুঝি চাপা পড়ে যায়। কারণ রঙ সহজেই চোখকে ভোলায়, মাথাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। আর এ-কথা তো সবারই জানা, দার্জিলিঙের প্রকৃতি এমন সেজে বসে আছে যে মানুষের মুখ ঢাকা পড়ে। রঙ শুধুই চোখ টেনে নিয়ে যায় বর্ণালীর বৈচিত্র্যে। রঙে মানুষ তখনিই ফোটে যখন প্রকৃতি বাইরের শোভা নয়, মানুষের ভেতরে এসেছে, মানুষ প্রকৃতিকে আত্মস্থ করেছে। এ-ছবিতে রঙ সর্বত্রই নয়ন-লোভন কিন্তু কোথাও তাৎপর্যমণ্ডিত নয়।

তবু 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সত্যজিৎ রায়ের ভবিষ্যতে আশা দেয়। কারণ

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'ই একমাত্র ছবি যেখানে তিনি মৌল মমতায় উপস্থিত, যে-মমতা শিল্পীকে সত্যের কাছে পৌঁছে দেয়। বিরোধে জর্জর মানুষ আড়াল তুলেছে নিজের চারপাশে; যে-যার বাস করছে একক, বিচ্ছিন্ন সব দ্বীপে; মনের গহনে অন্ধকার পাথর হয়ে আছে। ওই অন্ধকার একমাত্র গলে মমতার ছোঁয়ায়, সেতু গড়ে করুণার অশ্রুপাতের পর। সত্যজিৎ রায় কেমন করে যেন এই ছবিতে অজান্তেই রূপকথার ভোমরার মতো মমতার উৎস খুঁজে পেয়েছেন, আর তারই অন্তর্লীন চাপে ছবির কেন্দ্রে গড়েছেন ছোট্ট টুকলুকে। টুকলুই যেন কাঞ্চনজঙ্ঘা, যে কেবল শুদ্ধতার স্পর্শে, মমতার টানে যন্ত্রণার পাপড়ি খসায়, উড়িয়ে সরায় কালো মেঘের ছায়া, হঠাৎ আলোর ঝলমলানিতে ঝলমলিয়ে দেয় মলিন হতাশাস মুখগুলো।

ছবির কেন্দ্রে টুকলু তার প্রথম আবির্ভাব থেকেই শুদ্ধতার দীপ্তি ছড়ায়, ঘনিষ্ঠ প্রাণময়তার আলো ঠিকরে ওঠে তার লাল রঙের পোশাকে। যেহেতু শিশুই শুদ্ধ (এবং এ ছবিতে সর্বপ্রথম সত্যজিৎ রায় শিশুকে তার নিজের জগতে উপস্থিত করেছেন), শিশুই একমাত্র সত্যের আলোয় অসত্যের স্বরূপ খোলে। টুকলুর পাশে তাই অশোকের লোভ-মোহের চরিত্র স্পষ্ট ফোটে। টুকলুর পূর্ণতা আবার আছে মনীষায়। সে তার নবীন কৈশোরে সবেমাত্র জীবনের আভাস পেয়েছে। সবেমাত্র জীবনের কঠিন কালোছায়া ঘনিয়েছে তার চারপাশে। আর অমনি ওর হৃদয় মমতায় সত্য হবার জন্যে, পূর্ণ হয়ে ওঠার জন্যে খোঁজে এমন এক জগত যেখানে মানুষ নিছক আনন্দে, নিছক সারল্যে, প্রেমে, সত্য হয়ে ওঠে। তাই এতটুকু বাধায়, চাপে ওর মুখে আঁধার নামে, অবোধ শিশুর মতো পালাতে চায়, নিজেকে আড়ালে টেনে ভাবে তার মুক্তির পথ বুঝি এমনিতেই মিলবে। প্রণবকে নির্ভাবনায় প্রশংসা করে কিন্তু জানে না কোথায় যেন তাদের বাধা, অথচ মুক্তির সম্ভাবনাতে কেমন অবুঝ বিস্ময়। দুই জগতের দুরতিক্রম্য ফারাকে কতই সারল্যে সে বলে অশোককে "আমরা কি খারাপ?" জানে না, জানতে চায় না উদ্বেলিত মমতার জঙ্গমে মানুষে মানুষে বিরোধের কথা। সহজেই ডেকে নিতে পারে বন্ধুকে তার জীবনে, যেমন ডেকেছে টুকলু তার মা-বাবাকে, মায়ের জীবনের বেদনার অংশীদার হয়ে। এই জীবনে ডেকে নেওয়াই শুদ্ধতার লক্ষ্য—এই মমতাই শিল্পীর চৈতন্যের আলো। মনীষা-টুকলুর স্ফটিকে জীবনের রঙ ছড়ায় ও আকস্মিকে বেদনার পাড় বুনে বুনে আমাদের স্মৃতিতে, কল্পনায়, আর সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে আসে ক্রূর, নিষ্ঠুর, বিচ্ছিন্ন একাকিত্বের বেড়াজাল ছাড়িয়ে ঐকান্তিক ঘনিষ্ঠতার নিবিড় কেন্দ্রে।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র পথ সত্যজিৎ রায়কে হীন সমাজতন্ত্র থেকে মুক্তি দিতে পারে।

শান্তি বসু

দুই

ভারতের চলচ্চিত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিটির গুরু অত্যন্ত বেশি। প্রথমত এই আন্দোলনে এই প্রথম রঙীন ছবি। দ্বিতীয় এই আন্দোলনের মুষ্টিমেয় নেতাদের মধ্যে একজন ও এই আন্দোলনের প প্রদর্শক সত্যজিৎ রায়ের শিল্পজীবনে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' একটি তাৎপর্যময় পদক্ষে তৃতীয়ত বাংলাদেশের সাহিত্যজগতের পরিপ্রেক্ষিতেও ছবিটি গুরুত্বপূ তাছাড়া প্রচলিত অর্থে কাহিনীবর্জিত ছবিটি গঠনের দিক থেকে স নতুন ও পরিচালকের সাহসের দ্যোতক।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র সঙ্গে সত্যজিৎবাবুর পূর্ববর্তী ছবির তুলনা খুবই ফলপ্র ছবিটির মেজাজের দিক দিয়ে এর নিকটাত্মীয় 'পরশপাথর'। তীক্ষ্ণ বা তীব্র ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছিলুম পরেশবাবুকে, বা সেই অ দৃশ্যটি যেখানে থানায় পরেশবাবু তাঁর বহুবার ট্রাম-থেকে-পড়ে-যাওয়া হি হাঁটু দেখিয়ে বলেন বাঙালী নিম্ন মধ্যবিত্তের স্বপ্নের কথা। তেমনই এ আমরা পেয়েছি মা-কে, রায়বাহাদুরের অনেক দুঃখ-সওয়া অনেক খোঁ খাওয়া প্রাজ্ঞ গৃহিণীকে। সম্পূর্ণ অন্য একটি জগতের হালচাল, বা তথাকথিত উচ্চসমাজের নগ্ন রূপ। এছাড়া গঠন ও কাহিনীর কাল দিক দিয়ে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' শুধু সত্যজিৎ রায়ের কাজের ক্ষেত্রে নয়, ভারতের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই নতুন। সেদিক দিয়ে এর গুরুত্ব 'প পাঁচালী'র সঙ্গে তুল্য। 'পথের পাঁচালী'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব কিংবা ইন্দি ঠাকরুণের "হাঁগা কি হয়েছে?" মনে রেখেও একথা বলা চলে যে সে সত্যজিৎবাবু যা দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ নয়। 'পথের পাঁচা 'অপরাজিত'তে বিভূতিভূষণের বিশ্বস্ত লেখনীর সঙ্গে সুপরিচিত অনে কাছে 'পথের পাঁচালী'র অংশবিশেষ বিক্ষিপ্ত এবং সংহত 'অপরাজি অসম্পূর্ণ লাগে। বিভূতিবাবুর বই-দুটিতে সব শিথিলতা সত্ত্বেও বা গ্রামের অপুর এলোমেলো জীবনের সামগ্রিক চেহারা মেলে। অপেক্ষাকৃত সংহত ও সীমায়িত পরিসরে তাকে দেখে মন ভরে না। একথা সর্বজনবিদিত যে পৃথিবীর চলচ্চিত্র ইতিহাসে 'পথের পাঁচালী' নতুন সংযোজন এবং বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র কাহিনী সত্যজিৎবাবুর মেজাজের সঙ্গে একেবারে খেয়ে যায়। সেজন্যই হয়তো যে ব্যঙ্গের বাহুল্য 'পথের পাঁচালী'তে লে আপত্তিকর তাই এখানে হয় অত্যন্ত অর্থপূর্ণ ও ছবির অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতপক্ষে সত্যজিৎবাবুর 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'র পরের ছবিতেই মনে হয়েছে তিনি স্বকীয় পথ খুঁজছেন। আজ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' পথের শেষ দেখে বোঝা যায় 'অপুর সংসার'-এর দ্বিতীয়ার্ধ, 'জলসা 'দেবী'র দ্বিতীয়ার্ধ বা 'তিনকন্যা'য় রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রায় বিপ্রতি পরিবর্তন কেন। তাছাড়া প্রতিটি ছবিই 'পথের পাঁচালী' থেকে দূরে

যাওয়া, শহুরে বিদগ্ধ মনে ফিরে আসার দ্যোতক। কারণ সত্যজিৎবাবুর শিল্পী-মেজাজ দেখা গেল তীক্ষ্ণদৃষ্টি কিন্তু মোলায়েম ব্যঙ্গের, তাঁর কল্পনায় রং চড়ায় এক নির্মম হাস্য। 'লীয়র'-এর কাব্যানুবাদ বা প্রথম সফল বিজ্ঞানকল্পনা-কাহিনী তাঁর কলমে এই জন্যই হয়তো ফোটে ভালো।

সাধারণভাবে আমরা দেখেছি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় বিধৃত যে জগত তার আয়রনিক রূপায়ণে বাংলা উপন্যাস ব্যর্থ। কোনো কোনো বাংলা কবিতার সহাস সাবালক অভিব্যক্তির তুলনায় এই জগতের রূপায়ণে অলীক বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতার ছবি বা খুবই কাল্পনিক রোমান্টিকতার পরিচয় বাংলা উপন্যাসে মিলবে। সত্যজিৎবাবুর ফিল্মে এই জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি এসেছে নির্মোহ সুকুমার ব্যঙ্গের গন্ধ রীতিতে। এটা এ ছবির শ্রেষ্ঠ গৌরব।

রঙের ব্যবহারের বিষয়ে দুটি আপত্তি শোনা গেছে। প্রথম, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'য় দার্জিলিং-এর দৃশ্যাবলী দেখানো হয়নি। দ্বিতীয়, ছবিটি রঙীন হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, সাদাকালোয় হলে আরো জোরালো হতো। প্রথমটির উত্তরে নিশ্চয়ই বলা যায় ছবিটি দার্জিলিং-এর ডকুমেণ্টারি নয়। এ-প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন কারণে অনেক সাধারণ দর্শকের ধারণা হয়েছিল 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' বেশ একটি রঙচঙে ছবি হবে এবং অনেকে তাঁরা হতাশও হয়েছেন। অন্যভাবে মনকে প্রস্তুত করে নিয়ে গেলে হয়তো তাঁদেরও ছবিটি হতাশ করত না। এজন্য রঙ ও রঙীন ছবি সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা পরোক্ষভাবে দায়ী বলা যেতে পারে। কিন্তু হিমালয় নয়, কাঞ্চনজঙ্ঘায় লুব্ধ সাহেবদের তৈরি করা শহর দার্জিলিং-এর সাজানো-গোছানো সীমাবদ্ধতাই এ-ছবির মূল পট।

'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র রঙের ব্যবহার অসম! গোড়ার দিকে বা একেবারে শেষ শটটিতে যথোপযুক্ত না হলেও রঙের ব্যবহারে ছবিটি অনন্য। রঙ কোনো জায়গায়ই চোখকে পীড়া দেয় না। কয়েকটি স্থানে রঙের ব্যবহার ছবিকে অভাবনীয় সাহায্য করে। সাঙ্গীতিক অর্থময়তায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে রঙ: নেপালী শিশুটির লাল ফুল চিবিয়ে খাওয়ার দৃশ্যে বা "এ পরবাসে রবে কে হায়"-এর সময় মায়ের মাথার ঘোমটার লালটুকু। রায়বাহাদুরের বড়জামাই ও বড় মেয়ের বিবাহবিচ্ছেদঘটিত দৃশ্য অনেকের মনে হয় একঘেয়ে। জীবনে এই একঘেয়ে অপ্রিয় ঘটনাটি অবশ্য বহু ঘটে এবং আজ অবধি বাংলা চলচ্চিত্র-আন্দোলনের কোনো ছবিতে এ ঘটনাটি ঘটে নি। তাছাড়া এ-ঘটনা পরিচালক যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে এ প্রশ্ন ওঠা অনুচিত। শুধু রঙের ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই এর সমাধান হয়। তবে দৃশ্যটির দৈর্ঘ্য বা কেটে "এখন আমাদের কি হবে" আসার মধ্যে আপত্তির কারণ থাকতে পারে। সে কথা বলতে গেলে পাহাড়ী সান্যালের নিউক্লিঅর টেস্টের ফলে পাখিদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হঠাৎ দুশ্চিন্তা, ছবিবাবুর অতিরিক্ত পিতৃসুলভ স্নেহপ্রকাশ বা অশোকের হাতপা ছুঁড়ে দার্জিলিংস্তুতি ইত্যাদি অনেক কিছুই হয়তো কমবেশি

আপত্তিকর ঠেকে। এ নিয়ে প্রচণ্ড তর্কে নিষ্পত্তি মেলে না। কারণ বোধহ এ ধরনের সূক্ষ্ম ছবি দর্শকের রুচির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। ছোটখা মতান্তরের সম্ভাব্যতা ও বারংবার দর্শনে মতপরিবর্তন তাই এ ছবির ক্ষে অনিবার্য।

মায়ের "এ পরবাসে" গানটি ও নেপালী শিশুটির শেষ গানটি ভোলা যা না। তেমনিই কানে বাজে দু-একটি কথার সুর: "আমি কিন্তু আজ বে সাজছি-না" বা "অনুমনু এক নয় গো।" কথার বাহাদুরিতে এ ছ সত্যজিৎ রায়ের সেরা ছবি। বেশি কথা বলা এজগতের স্বভাব। কথা এদের চেনা যায়। রায়বাহাদুর, ইঞ্জিনীয়ার ব্যানার্জী…কয়েক ঘণ্ট কথার মধ্যেই এঁরা আগাগোড়া চেনা হয়ে যান। কথার পুনরুক্তি একাধিক অর্থের অভিব্যক্তি বিস্ময়কর। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র অর্থবহতার ব্যা অবশ্যই সংলাপে সীমাবদ্ধ নয়—ইঞ্জিনীয়ার ব্যানার্জীর সঙ্গে মনীষা পুষ্পতত্ত্বের আলোচনার পর নেপালী শিশুটির সেটা অকাতর চর্বণ, পিঠে বো নিয়ে গাধার দলের যাওয়া ও ব্যানার্জীর ডাকে মনীষার না শুনতে পা ব্যাঙের বাজনা, সাহেবদের ছুটন্ত ঘোড়া ও "গুড ইভনিং" বলা, ইত্যাদি।

অভিনয়ে সকলেই কমবেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সব চেয়ে বে নেপালী শিশুটি, করুণা বন্দোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথন। সঙ্গীতও অত্য সুপ্রযুক্ত, অর্থবহ: যেমন সেই বেহালার চড়া সুরে পাঁচশিকড়ের গা আত্মপ্রকাশ—যার তলায় বিবাহবিচ্ছেদ আলোচনারত দম্পতি। এ ছবি বোধ করি সত্যজিৎবাবুর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতারোপ।

সবশেষে আবার রঙের কথায় ফিরে আসি। দুর লংশটে লোককে চে (বান্টি চ্যাটার্জী ও বিদ্যা সিংহ), পোশাকের তারতম্যে লোক চে (অশোকের বিদঘুটে পোশাক ও পাৎলুন, রায়বাহাদুরের লাল রুমা ইত্যাদি ছাড়াও পুরো editing pattern-এ রঙের পৌনঃপুণ্য ছবিতে বি সহায়তা করেছে। হয়তো সাদাকালোয় এক কঠোর ব্যঞ্জনা আসত রঙে সব সময় আসেনি। কিন্তু যে দৃশ্যে মনীষা ছুটে পালায়, ফ্যাকাশে মুখে কাঁদে, ওদিকে ব্যাণ্ড বাজে, ব্যানার্জী চলে যায়—সে দৃশ্যে কঠোর ব্যঞ্জ কি অভাব আছে? বরং মনীষার ফ্যাকাশে মুখ সাদা কালোয় আসত না অনেক দৃশ্য হয়তো এরকম ব্যঞ্জনাময় হয়নি, কিন্তু তা কি রঙের দোষ রঙের ব্যবহারের অসমতা? ছবির শেষে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি আরও ভা হলে ছবির এক রূপক অর্থ সম্পূর্ণ হতো।

সঙ্গীতপরিচালক, সংলাপকার, কাহিনীকার ও পরিচালক হিসে সত্যজিৎ রায় এ ছবিতে সংহতির যে স্তরে পৌঁছেছেন তাতে আম আশ্বাম্বিত হই।

জিষ্ণু দে

বিশেষ ঘোষণা

'পরিচয়'-এর আগামী ভাদ্র সংখ্যাটি 'পরমাণু ও শান্তি' বি সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ উদ্দেশে পারমাণ তেজের প্রয়োগ, বিশ্বমানবের শান্তি-প্রচেষ্টা, নিরস্ত্রীকর সমস্যা, তেজস্ক্রিয়তার ফলাফল, সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরোধী উপ ও চলচ্চিত্র, মস্কো নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের বিবরণ ও সিদ্ধা ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি সুনির্বাচিত প্রবন্ধ এই সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

এই সংখ্যার লেখকদের মধ্যে আছেন : জে. বি. এস. হলডে বি. ডি. নাগচৌধুরী, আর. কে. মণ্ডল, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যা গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সুনীল সেন, শ্যামল চক্রবর্তী, চিদা সেহানবীশ, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধ্রুব গুপ্ত, শঙ্কর চক্রব অমল দাশগুপ্ত প্রভৃতি।

মস্কো নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে গৃহীত লেখকদের প্র প্রতি আবেদন, সার্ত্র ও লাঙ্গ-এর প্রবন্ধ এবং পিকাসো অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর আঁকা ছবি এই সংখ্যা বিশেষ আকর্ষণ।

দাম এক টাকা

পরমাণু ও শান্তি সংখ্যা

পরিচয়



ভাদ্র